নাগরিক কমিটি ২০০৬-এর
উদ্যোগে প্রণীত

বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১

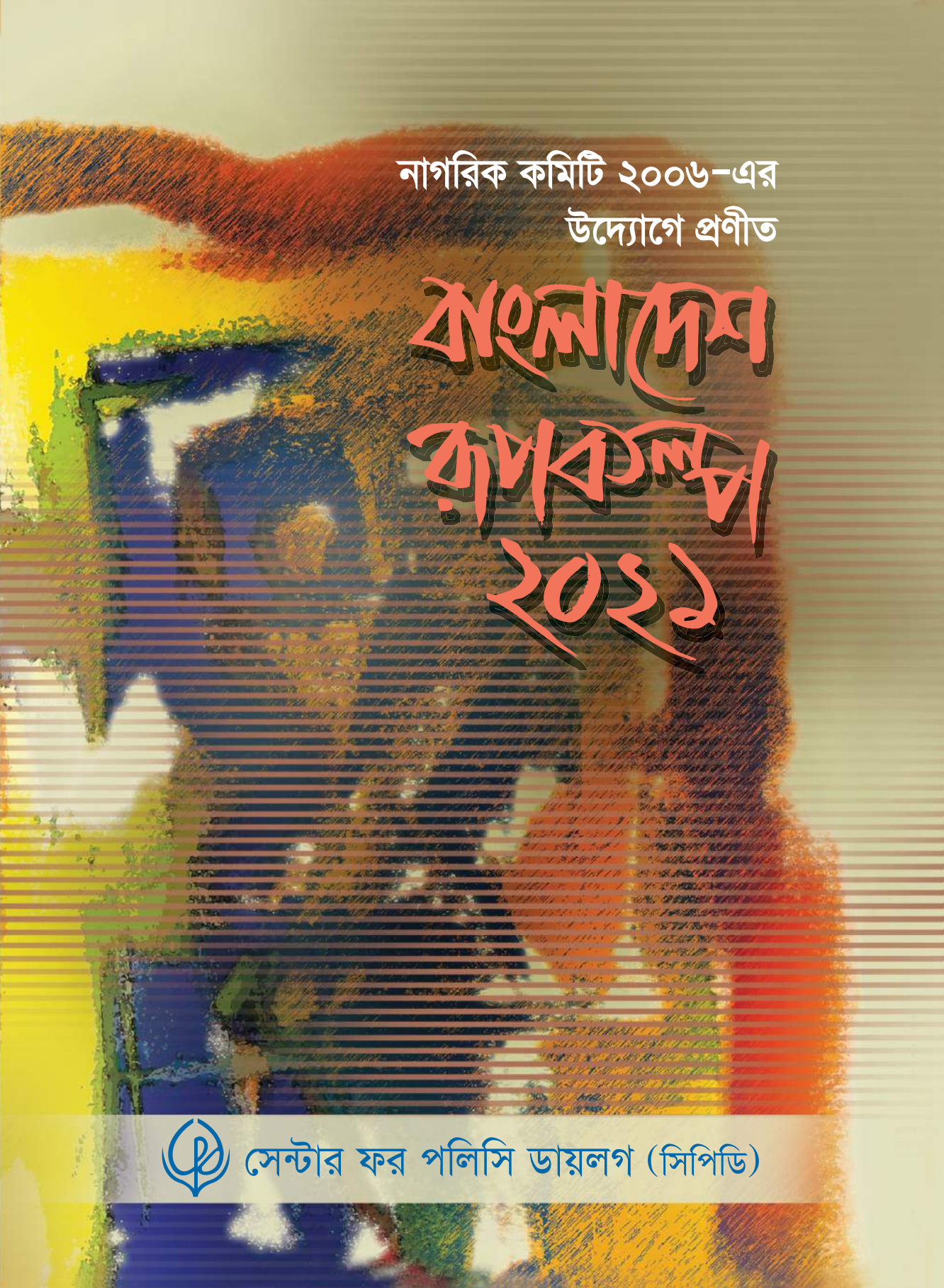

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

নাগরিক কমিটি ২০০৬-এর
উদ্যোগে প্রণীত

বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৪১৪
আগস্ট ২০০৭

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসৌষ্ঠব
হিরন্ময় চন্দ

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
সাইফুল হাসান

প্রকাশক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০সি, সড়ক ১১, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন (৮৮০-২) ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৮১২৪৭৭০
ফ্যাক্স (৮৮০-২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল cpd@bdonline.com
ওয়েবসাইট www.cpd-bangladesh.org

মূল্য
৫০.০০ টাকা

মুদ্রক
এনরিচ প্রিন্টার্স
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

সূচি

প্রাক্‌কথন — সাত

ভূমিকা — এগারো

'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর সদস্যবৃন্দ — তেরো

'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' প্রণয়ন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ডের ধারাক্রম — পনেরো

অভীষ্ট ১

একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা — ১-৭

১.১ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা
১.২ বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া
১.৩ একটি স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রচারে অর্থ জোগানোর ব্যবস্থা
১.৪ শিষ্টজনোচিত ও চিন্তাশীল মতবিনিময় এবং তর্কবিতর্কমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি
১.৫ একটি কার্যকর সংসদ, এবং দায়বদ্ধ সাংসদবৃন্দ
১.৬ সংসদে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা সাংসদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন
১.৭ তথ্য-অধিকার আইনের ব্যাপক প্রয়োগ
১.৮ স্বাধীন, দক্ষ, বিকেন্দ্রীকৃত, দুর্নীতিমুক্ত এক বিচারব্যবস্থা
১.৯ মানবাধিকার রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান ও আইনের শাসন
১.১০ নির্দলীয় ও পেশাজীবীসুলভ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা
১.১১ বর্ধিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি
১.১২ সদাসতর্ক ও সক্রিয় সুশীল সমাজ

অভীষ্ট ২

একটি দক্ষ, জবাবদিহিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রীকৃত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা — ৮-১৩

২.১ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া
২.২ স্বচ্ছ ক্রয় নীতিমালা
২.৩ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক প্রচলন
২.৪ কার্যকর দুর্নীতিদমন কমিশন
২.৫ দরিদ্রমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেটের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
২.৬ স্বাধীন বাংলাদেশ ব্যাংক
২.৭ দক্ষ, স্বচ্ছ ও গণবান্ধব ভূমি-প্রশাসন ব্যবস্থা
২.৮ একটি বিকেন্দ্রীকৃত ও উন্নত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
২.৯ বিশ্বাসী, বিকেন্দ্রীকৃত ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী
২.১০ স্থায়ী বেতন ও চাকুরি কমিশন

অভীষ্ট ৩

একটি দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়া ১৪-২০

৩.১ কৃষিক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীলতা, বৈচিত্র্যীকরণ ও বাণিজ্যীকরণ
৩.২ শিল্প ও সেবাখাতে দ্রুত উন্নতি
৩.৩ প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগের পরিবেশ
৩.৪ বর্ধিষ্ণু বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবেশ
৩.৫ বৈচিত্র্যমুখী রপ্তানির ভিত্তি ও বাজার
৩.৬ দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের সম্প্রসারিত বাজার
৩.৭ গ্রামীণ অ-কৃষিজ শিল্প ও সেবার ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলের বিকাশ
৩.৮ নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পরিব্যাপ্ত অর্থনৈতিক গভীরতা
৩.৯ দক্ষ শ্রমশক্তি
৩.১০ দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমরপ্তানি থেকে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

অভীষ্ট ৪

স্বাস্থ্যসম্পদময় একটি জাতিতে পরিণত হওয়া ২১-২৬

৪.১ প্রজননহারের প্রতিস্থাপন স্তর
৪.২ সকল শিশুর জীবন রক্ষা ও সুস্থ সবল বিকাশ
৪.৩ নারীর উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও সার্বিক কল্যাণ
৪.৪ প্রাথমিক ও মানসম্মত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা
৪.৫ মা ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টির আয়োজন
৪.৬ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ ও তার সুরক্ষা
৪.৭ জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে নির্মল পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা
৪.৮ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ও এলাকার মানুষজনের অংশগ্রহণ
৪.৯ সুকঠোর ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থা

অভীষ্ট ৫

সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলা ২৭-৩৩

৫.১ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা
৫.২ সুসংহত/একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা
৫.৩ সকল স্তরে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
৫.৪ যুবসমাজে মূল্যবোধ পরিচালিত বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা
৫.৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান
৫.৬ সর্বোত্তম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক উচ্চপর্যায়ের অবৈতনিক শিক্ষাদান
৫.৭ গবেষণাকর্মের সুযোগ বৃদ্ধি
৫.৮ বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যকর শিক্ষাপ্রশাসন
৫.৯ সর্বজনীন কম্পিউটার শিক্ষা
৫.১০ শিক্ষার সকল স্তরে নারী ও পুরুষের ভারসাম্য রক্ষা

৫.১১ শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের সংস্কৃতি নির্মাণ
৫.১২ জনশিক্ষায় অর্থায়ন

অভীষ্ট ৬

বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে সুসম্পৃক্ত একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া ৩৪-৩৮

৬.১ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিপণন কৌশল উদ্ভাবন
৬.২ চট্টগ্রামের সমুদ্রতট ধরে মহাসমুদ্রবন্দর নির্মাণ
৬.৩ সুপার হাইওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে মহাসমুদ্রবন্দরের সংযোগস্থাপন
৬.৪ মহাসমুদ্রবন্দরের কাছাকাছি একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ
৬.৫ মঙ্গলা নৌবন্দরের উন্নয়ন ও সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ
৬.৬ তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিনির্ভর সেবাখাতকে আরও বেশি সমর্থন জোগাতে সাইবার পার্ক গড়ে তোলা
৬.৭ সারা দেশব্যাপী অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা
৬.৮ আঞ্চলিক জ্বালানি-বাজারের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ সাধন
৬.৯ পুঁজিবাজারের বিস্তৃতি সাধন ও গভীরতা বৃদ্ধি
৬.১০ যথোপযুক্ত শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণ দান
৬.১১ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির কার্যকর একীভবন

অভীষ্ট ৭

টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা ৩৯-৪৪

৭.১ কার্যকর নগর-পরিকল্পনা
৭.২ বায়ুদূষণ রোধ
৭.৩ পানিদূষণ রোধ
৭.৪ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় নির্দিষ্ট জলাভূমি সংরক্ষণ
৭.৫ আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা
৭.৬ ভূমির উৎপাদনক্ষমতার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৭.৭ শিল্পকারখানা, হাসপাতাল ও গার্হস্থ্য বর্জ্যের পরিবেশগতভাবে নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
৭.১ জ্বালানির ব্যয়-সাশ্রয়ী বিকল্প উৎস
৭.৯ ঘোষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণ
৭.১০ কার্যকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৭.১১ পরিবেশের অভিঘাত নির্ণয় (Environment Impact Assessment—EIA) পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানীকরণ ও কার্যকর প্রয়োগ

অভীষ্ট ৮

একটি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করা ৪৫-৫০

৮.১ কম সুবিধাভোগী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে উৎপাদনক্ষম সম্পদ পৌঁছানো

৮.২ শ্রমজীবী ও বঞ্চিতদের কর্পোরেট মালিকানার অধিকার
৮.৩ দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তাবলয়
৮.৪ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা
৮.৫ সম্বলহীনদের জন্য ন্যূনতম কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা
৮.৬ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি
৮.৭ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
৮.৮ সহায়সম্বলহীন ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা
৮.৯ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিসত্তাগত বৈচিত্র্যকে জাতীয় ঐতিহ্য রূপে বিকশিত করা
৮.১০ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস

প্রাক্‌কথন

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-র উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২০শে মার্চ জাতীয় স্তরে এক নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক এই সংলাপে দেশের বিশিষ্টজনদের নিয়ে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' গঠিত হয়েছিল। নাগরিক কমিটির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা বাংলাদেশের জন্য একটি রূপকল্প (vision) তৈরি করবেন। 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' বর্তমান রূপে প্রকাশিত হওয়ার পেছনে নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, অংশীবর্গ (stakeholders), জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিককুল ও বিশেষজ্ঞমহলের ব্যাপৃত ভূমিকা রয়েছে। নাগরিক কমিটির সচিবালয় হিসেবে সিপিডি এই রূপকল্প প্রণয়নের মূল দায়িত্ব পালন করে। সিপিডি *দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো* ও চ্যানেল আইয়ের সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে দেশের ১৫টি শহর—ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়কে সামনে রেখে 'আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ' ও রাজধানী ঢাকায় 'জাতীয় ফোরাম' আয়োজন করে। এ সংলাপে সব মিলিয়ে কমবেশি ৮০০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় ১৫০০ মানুষ তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। নাগরিক কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থেকে সে-সব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় রূপকল্পের খসড়াকৃত ৮টি অভীষ্ট নিয়ে আলাদা আলাদা ৮টি বিশেষজ্ঞ পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়। অধিকন্তু, রূপকল্পের খসড়া সম্পৃক্ত সকল গোষ্ঠীর নজরে আনার জন্য ওয়েবসাইটেও প্রচার করা হয়। সে-সূত্রে দেশের ভেতরে ও বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের অনেকেই তাৎপর্যময় বহু চিন্তা ও মতামত আমাদের জানিয়েছেন। এ-সব ধরনের মতামত আত্তীকৃত ও সময় সময় পরিমার্জিত হয়েই 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' তার বর্তমান অবয়ব পেয়েছে।

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে ঘিরে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কী, তার পরিপ্রেক্ষিতেই নাগরিক কমিটি পরস্পরসম্পৃক্ত মোট ৮টি অভীষ্ট শনাক্ত করেছে। অভীষ্টগুলো হচ্ছে:

- একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা;
- একটি দক্ষ, জবাবদিহিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রীকৃত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- একটি দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়া;
- স্বাস্থ্যসম্পদময় একটি জাতিতে পরিণত হওয়া;
- সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলা;
- বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে সুসম্পৃক্ত একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া;

এই রূপকল্প রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকর ও রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের যে প্রতিচ্ছবি দাঁড়াবে তারই একটি সুস্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করানো। চিহ্নিত ৮টি অভীষ্ট ২০২১ সাল নাগাদ কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সে-সম্পর্কে এই রূপকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপের ধারণা দেওয়া হয়েছে।

- টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং
- একটি অন্তর্ভুক্তিকর (inclusive) ও সমতাভিত্তিক (equitable) সমাজ নির্মাণ করা।

এই রূপকল্প রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকর ও রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের যে প্রতিচ্ছবি দাঁড়াবে তারই একটি সুস্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করানো। স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদি নীতি-উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত ৮টি অভীষ্ট ২০২১ সাল নাগাদ কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সে-সম্পর্কে এই রূপকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপের ধারণা দেওয়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সূচিকে (actionable agenda) আরও ফলপ্রসূ করার জন্য অংশীবর্গের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উপায়সমূহকে বিশদ করার প্রয়োজন দেখা দেবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রূপকল্প নিয়ে আলোচনার নানা পর্যায়ে আরও কয়েকটি বিষয় কিছু কিছু মানুষ আমাদের সম্মুখে উত্থাপন করেছিলেন। যেমন, দুর্নীতি বিষয়টি আলাদা করে চিহ্নিত হতে পারে কি না। কিংবা সংস্কৃতি বিষয়টি কি যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে না? এ-ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, দুর্নীতিকে আমরা আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে বরঞ্চ অন্য আর সব বিষয়ের সঙ্গে অবিভাজ্য বলে বিবেচনা করেছি। একইভাবে সংস্কৃতি, বৃহত্তর অর্থে, আমাদের সৃজনশীল শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এক একটি অভীষ্ট বিস্তীর্ণ ভাবনারই সন্ধিত রূপ। আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে শেষ বিচারে আমরা একটি প্রায়োগিক সীমানার মধ্যে রাখতে চেয়েছি। এই রূপকল্প যাতে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই অভীষ্টগুলো নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

রাজনীতিবিদ, নীতি-নির্ধারক, উদ্যোক্তাবৃন্দ, দেশের উন্নতিতে নিবেদিত বিভিন্ন পেশাজীবী, চাকুরিজীবী ও সমাজকর্মীসহ সকল নাগরিকের কথা মনে করে এই রূপকল্প প্রণীত হয়েছে। যাতে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে সেজন্য যথাসম্ভব সহজ ভাষায়—ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই—এটি রচিত।

ঋণস্বীকার

'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' রচনা করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে আমরা সহৃদয় সহায়তা পেয়েছি। 'আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপে' যে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা প্রত্যেকটি বিষয় ধরে মতামত উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আটটি অভীষ্টকে কেন্দ্র করে আয়োজিত আলাদা আলাদা আটটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শসভায় যাঁরা উপস্থিত হয়ে আমাদের মূল ধারণাকে আরও বিস্তৃত ও পরিশীলিত করেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাতেই হয়। এর বাইরেও বহু মানুষ ওয়েবসাইট বা অন্যান্য মাধ্যমে তাঁদের মতামত জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর প্রত্যেক সদস্য যে তাঁদের মেধা ও সময়ের অনেকটাই রূপকল্প রচনার পেছনে ব্যয় করেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের এই রূপকল্পের বিষয়বস্তু তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছেন *দ্য ডেইলি স্টার*-এর মাহফুজ আনাম, *প্রথম আলো*-র মতিউর রহমান ও চ্যানেল আইয়ের শাইখ সিরাজ এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ। এ সুযোগে তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সিপিডি গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ, যোগাযোগ বিভাগের প্রধান আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ ও সে-বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ এবং প্রশাসনিক বিভাগের

সহকর্মীবৃন্দের অনলস পরিশ্রম ছাড়া এ উদ্যোগ কখনোই সম্ভব হত না। সিপিডি-র ভিজিটিং ফেলো ইফ্‌ফাত শরীফ 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এটি প্রকাশনার সব দায়িত্ব পালন করেছেন নাঈম হাসান।

আর এ পুরো উদ্যোগে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন 'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর আহ্বায়ক ও সিপিডি-র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

সবশেষে, মূল ইংরেজি থেকে 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-এর বাংলা রূপান্তর করেছেন হায়াৎ মামুদ। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সদস্য সচিব, 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' ও
নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১

ভূমিকা

দু-দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-যুদ্ধে পরিণত হওয়ার পর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, উন্নতিশীল ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সেই সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র ১৫ বছর অতিক্রম করার পর দেশ এত দিনে কী অর্জন করল, এবং পরবর্তী ১৫ বছরে আরও কী-কী অর্জন করা চাই সে-সবের একটা খতিয়ান এখন সংগতভাবেই নেওয়া প্রয়োজন। আরও বেশি করে, কেননা ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০-বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। তত দিনে ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের সময়ে যে-প্রজন্মের বয়স ১৮ ছিল, তাঁরা কর্মময় জীবন প্রায় শেষ করে আনবেন। খুবই স্বাভাবিক যে, কর্মজীবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে তাঁরা দেশের কতদূর কী ঘটল তা দেখতে চাইবেন। দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তার চেহারাটাই-বা কেমন হবে?

আমাদের এ রূপকল্পে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এমনি ধারার সুশাসনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ কালক্রমে এশিয়ার এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে—তৈরি হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনৈতিক আবহাওয়ার, যার মূলে থাকবে সুদক্ষ ও প্রশিক্ষিত এক শ্রমশক্তির জোগান। আমরা এরকমই স্বপ্ন দেখছি। ২০২১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশকে আজকের মালয়েশিয়ার মতো দেখতে চাই। সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের অবশ্যই এমন এক হৃদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন সমাজ গড়তে হবে যেখানে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবাধ সুযোগ গ্রহণ নিশ্চিত হবে, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় সকলের সমান অধিকার থাকবে, দুস্থদের দেখাশোনা হবে, সর্বগ্রাসী আবহাওয়া-বিনষ্টি থেকে দেশ রক্ষা পাবে, এবং জাতীয় গর্বের উৎস হিসেবে সব রকম সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত বৈচিত্র্যকে মান্য করা হবে। বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দ এ-সব অভীষ্ট অর্জনে ঐকমত্য পোষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সকল করণীয় কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন বলে আমরা আশা করি। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে চূড়ান্ত দারিদ্র্যগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করে, শক্ত গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও সুশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর দাঁড় করিয়ে যাতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কৌশলগত কর্মপন্থা কার্যকর করা যায় সেদিকে তাঁরা নিবেদিতপ্রাণ হবেন—এটিই আমাদের চাওয়া।

২০২১ সালকে সামনে রেখে প্রণীত এই রূপকল্প পরস্পরসম্পৃক্ত ৮টি অভীষ্ট নিরূপণ করেছে। আমাদের রূপকল্পকে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রত্যেকটি অভীষ্ট অর্জন করতেই হবে; জাতির জন্য এগুলো হচ্ছে বিশেষ জরুরি। 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-এ বিন্যস্ত ৮টি ভাগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্যবিন্দুর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এ-সব লক্ষ্যবিন্দুর কয়েকটি অল্প সময়ের ভেতরে অর্জন করা সম্ভব, আবার কিছু রয়েছে যেগুলোর জন্য বেশি সময় বরাদ্দ করার প্রয়োজন পড়বে। আমরা মনে করি, রূপকল্পে চিহ্নিত এ-সব লক্ষ্যবিন্দু ২০২১ সালের মধ্যে অর্জিত হওয়া সম্ভব, এবং আমাদের জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হওয়া সম্ভব। প্রতিটি অভীষ্টের অন্তর্গত লক্ষ্যবিন্দুসমূহ অর্জনের জন্য যে-সব স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করতে হবে তাদের কয়েকটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিছুকাল আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকারপ্রসূত মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করণীয় কর্মতালিকা সংবলিত একটি পৃথক নথিও প্রস্তুত করা হয়েছিল—যার মূল ভিত্তি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত নাগরিক সংলাপ ও পরামর্শসভা। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের আশু কর্মসূচি' শীর্ষক ঐ বিবরণ ঢাকা মহানগরীতে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ আয়োজিত এক জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়। নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিশেষজ্ঞমহল ও প্রধান প্রধান অংশীবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে 'গণপ্রতিনিধিত্ব

ভূমিকা

আদেশ (সংশোধনী) ২০০৬-এর খসড়া সুপারিশ' নামে আরেকটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সংসদ-নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনপ্রার্থিতা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ সেখানে ছিল। ২০০৬ সালের ১৯শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিকট প্রণিধানযোগ্য সব সুপারিশকে এক জায়গায় করে একটি প্রতিবেদন নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থাপন করেন। ৯ই ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জাতীয় ফোরামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্পাদকদের হাতে ঐ প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়। আসন্ন নব নির্বাচিত সংসদের সদস্যবৃন্দ ও পরবর্তী সরকারের কাছেও এগুলো যথাসময়ে পেশ করা হবে।

'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর সদস্যবৃন্দ

আহ্বায়ক

রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সিপিডি

সহ-আহ্বায়ক (বর্ণানুক্রমে)

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
সভাপতি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র

এম সাইদুজ্জামান
সাবেক অর্থমন্ত্রী ও
চেয়ারম্যান, ব্যাংক এশিয়া

লায়লা রহমান কবির
সাবেক সভাপতি, এমসিসিআই ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কেদারপুর টি কোম্পানি লিমিটেড

সদস্যবৃন্দ (বর্ণানুক্রমে)

আনিসুজ্জামান
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবুল আহসান
সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও
প্রাক্তন মহাসচিব, সার্ক

ইকবাল মাহমুদ
সাবেক উপাচার্য ও
অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

এ এস এম শাহজাহান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
প্রাক্তন মহা পুলিশ পরিদর্শক

এঞ্জেলা গোমেজ
নির্বাহী পরিচালক, বাঁচতে শেখা

এম মুজিবুল হক
সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব
বাংলাদেশ সরকার

এম হাফিজউদ্দিন খান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
প্রাক্তন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জামাল নজরুল ইসলাম
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জামিলুর রেজা চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

ফজলে হাসান আবেদ
চেয়ারপারসন, ব্র্যাক

মাহমুদা ইসলাম
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
সভাপতি, উইমেন ফর উইমেন

মাহমুদুল ইসলাম
সাবেক এটর্নি জেনারেল ও
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
চেয়ারম্যান, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ ইউনূস
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রামীণ ব্যাংক লিমিটেড

মেজর জেনারেল (অব) মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা প্রধান ও
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

লতিফুর রহমান
সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
(এমসিসিআই) ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রান্সকম গ্রুপ

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
চেয়ারম্যান, এপেক্স ট্যানারি

স্যামসন এইচ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ (টিআইবি) ও
চেয়ারম্যান, স্কয়ার গ্রুপ

হাসান আজিজুল হক
প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য সচিব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' প্রণয়ন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ডের ধারাক্রম

২০০৫ সালের গোড়ার দিকে সিপিডি এ সম্পূর্ণ উদ্যোগের কর্মপরিকল্পনা নেয়। পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে এ কর্মকাণ্ডের পরিসর নির্ধারিত হয়। এ সূত্রে ২৫শে আগস্ট ২০০৫ ব্র্যাক সেন্টারে নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। এমনি করে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ২০শে মার্চ ২০০৬ উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।

সূচনা

২০ মার্চ ২০০৬	'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক জাতীয় নাগরিক সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত, ঢাকা শেরাটন হোটেল

আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ

'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ'

২৯ এপ্রিল ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—ময়মনসিংহ, হোটেল মুস্তাফিজ
১৩ মে ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—যশোর, জেলা পরিষদ মিলনায়তন
২০ মে ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—কুমিল্লা, বীরচন্দ্রনগর মিলনায়তন
২৭ মে ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—বরিশাল, শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ভবন
১৭ জুন ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—সিলেট, জেলা পরিষদ মিলনায়তন
৭ জুলাই ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—রাঙামাটি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট
৮ জুলাই ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—চট্টগ্রাম, হোটেল পেনিনসিউলা মিলনায়তন
১৫ জুলাই ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—রংপুর, আরডিআরএস বেগম রোকেয়া মিলনায়তন
২২ জুলাই ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—খুলনা, জিয়া হল
৫ আগস্ট ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—রাজশাহী, নানকিং দরবার হল
১২ আগস্ট ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—ফরিদপুর, হোটেল র‍্যাফলস্ ইন
১৯ আগস্ট ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—পাবনা, বন্ধন কমিউনিটি সেন্টার
২৬ আগস্ট ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—বগুড়া, পর্যটন মোটেল
২ সেপ্টেম্বর ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—টাঙ্গাইল, ভাসানী হল
৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬	নাগরিক সংলাপ—নারায়নগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ক্লাব কমিউনিটি সেন্টারে

বিশেষজ্ঞ পরামর্শসভা

'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১', সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা

৩ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ১: একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা
৭ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ২: একটি দক্ষ, জবাবদিহিপূর্ণ স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রীকৃত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
৯ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৩: একটি দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া

কর্মকাণ্ডের ধারাক্রম

১০ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৪: স্বাস্থ্যসম্পদময় একটি জাতিতে পরিণত হওয়া
১৪ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৫: সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলা
১৬ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৬: বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে সুসম্পৃক্ত একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া
২১ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৭: টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা
২৮ আগস্ট ২০০৬	অভীষ্ট ৮: একটি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করা

'নাগরিক কমিটি ২০০৬'-এর সভা

১৫ এপ্রিল ২০০৬	প্রথম সভা, সিপিডি কার্যালয়
২৪ এপ্রিল ২০০৬	দ্বিতীয় সভা, সিপিডি কার্যালয়
৩০ এপ্রিল ২০০৬	তৃতীয় সভা, সিপিডি কার্যালয়
৬ মে ২০০৬	চতুর্থ সভা, সিপিডি কার্যালয়
১১ জুন ২০০৬	পঞ্চম সভা, সিপিডি কার্যালয়
১২ জুন ২০০৬	ষষ্ঠ সভা, সিপিডি কার্যালয়
১৬ জুলাই ২০০৬	সপ্তম সভা, সিপিডি কার্যালয়
২০ জুলাই ২০০৬	অষ্টম সভা, সিপিডি কার্যালয়
২৭ জুলাই ২০০৬	নবম সভা, সিপিডি কার্যালয়
১ সেপ্টেম্বর ২০০৬	পর্যালোচনা সভা, সিপিডি কার্যালয়
২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬	আসন্ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা, সিপিডি কার্যালয়
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬	পর্যালোচনা সভা, সিপিডি কার্যালয়
৩১ অক্টোবর ২০০৬	দশম সভা, সিপিডি কার্যালয়
০৬ ডিসেম্বর ২০০৬	একাদশ সভা, সিপিডি কার্যালয়
২০ জানুয়ারি ২০০৭	দ্বাদশ সভা, সিপিডি কার্যালয়
২৫ এপ্রিল ২০০৭	বিশেষ সভা, সিপিডি কার্যালয়

জাতীয় সংলাপ

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬	'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের আশু কর্মসূচি' শীর্ষক নাগরিক সংলাপ, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা
১৪ অক্টোবর ২০০৬	'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' বিষয়ে নবীন পেশাজীবীদের সঙ্গে সংলাপ, ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তন, ঢাকা
৪ নভেম্বর ২০০৬	'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর সংশোধনী' শীর্ষক নাগরিক সংলাপ, ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তন, ঢাকা

মতবিনিময় সভা

'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ'

২৭ মার্চ ২০০৬	সাংবাদিকদের সঙ্গে সভা, সিপিডি কার্যালয়

৪ এপ্রিল ২০০৬	নবীন পেশাজীবীদের সঙ্গে সভা, সিপিডি কার্যালয়
৬ এপ্রিল ২০০৬	কুটনীতিকদের সঙ্গে সভা, সিপিডি কার্যালয়
২ মে ২০০৬	সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সভা, সিপিডি কার্যালয়
৪ মে ২০০৬	সমোদ্যোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথম সভা, সিপিডি কার্যালয়
১১ মে ২০০৬	সমোদ্যোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিতীয় সভা, সিপিডি কার্যালয়
১৮ অক্টোবর ২০০৬	আইনজীবীদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর পর্যালোচনামূলক সভা, সিপিডি কার্যালয়
১১ জানুয়ারি ২০০৭	উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সভা, সিপিডি কার্যালয়

বিশেষ বৈঠক

৮ মে ২০০৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার রোধকল্পে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা সম্পর্কে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬'–এর প্রতিনিধিদলের সভা
২৩ মে ২০০৬	নির্বাচনে কালো টাকার অবাঞ্ছিত ব্যবহার ও সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী দুর্নীতি রোধকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬'–এর প্রতিনিধিদলের সভা
১৯ নভেম্বর ২০০৬	নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য প্রণীত সুপারিশমালা (আশু ও মধ্যমেয়াদে করণীয়), নাগরিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তাবিত জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২–এর সংশোধনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬'–এর সাক্ষাৎ

সংবাদ সম্মেলন

১৬ এপ্রিল ২০০৬	'নাগরিক কমিটি ২০০৬'–এর প্রথম সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও আশু কর্মসূচি সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন, সিপিডি কার্যালয়
১৭ জুলাই ২০০৬	'নাগরিক কমিটি ২০০৬'–এর দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলন—নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার সংক্রান্ত ৩৭ দফা উপস্থাপন, জাতীয় প্রেস ক্লাব
৭ নভেম্বর ২০০৬	'জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধনকল্পে অর্ডিন্যান্স জারির জন্য ''নাগরিক কমিটি ২০০৬''–এর প্রস্তাব' বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেস ক্লাব

নাগরিক ফোরাম

৯ ডিসেম্বর ২০০৬	নাগরিক ফোরাম, 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ', বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

অভীষ্ট ১

একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা

আমরা দেখতে চাই যে, ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যেখানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, সুযোগ ও আচরণ লাভের নীতি মান্যতা পাচ্ছে। অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র কার্যকর করতে হলে যে-সব গণতান্ত্রিক নীতি-নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানাদির মৌলিকভাবে প্রয়োজন পড়বে সে-সবের কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা গেল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সচল রাখার ক্ষেত্রে কিছু উন্নতিবিধান করতে যদি-বা কিছু কম সময় লাগে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্থবহ ও সুপ্রযুক্ত করে তুলতে দীর্ঘমেয়াদি সময়কাঠামোর প্রয়োজন হবে।

১.১ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা

রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা বহাল রাখতে হবে এবং দলের সর্বস্তরে নির্বাচিত নেতৃবর্গের মাধ্যমে অংশগ্রহণভিত্তিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম (দলীয় প্রধানের নির্বাচনসহ) চালু করতে হবে। সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থিতার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রার্থীকে রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হতে হবে। নির্বাচনের লক্ষ্যে আয়োজিত একটি দলীয় সভায় আলোচনা করে নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য দলীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে। নির্বাচনী এলাকা পর্যায়ে দলীয় প্রাথমিক সদস্যরা মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যেন খোলাখুলি কথা বলতে পারেন সে সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন করা রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক হতে হবে। সে-লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রতিলিপি, দলের ইশতেহার, দলের পক্ষ থেকে দলীয় নেতৃবর্গের নাম, প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে যে-সভায় তার কার্যবিবরণী ও দলীয় ইশতেহারের অনুমোদন, অডিট রিপোর্ট ও দলের অর্থ-সংকুলান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিল করতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ-সংকুলানের উৎস ও যাবতীয় অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশ অডিট হবে এবং শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির ক্ষেত্রে যেমন হয় সেভাবে জনসমক্ষে প্রচারিত হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (Representation of People Order, 1972)-র অধীনে 44CC ও 44CCC ধারা মোতাবেক রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করার বাধ্যতা পূরণ করতে হবে।

১.২ বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া

প্রয়োজন এক শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন—যা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য প্রণীত যাবতীয় আইন প্রয়োগ করতে পারবে। নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে বেশ কিছু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে। যেমন, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধীকরণে আইনি নির্দেশপ্রসূত উপায়াদির মাধ্যমে বৃহত্তর আনুষ্ঠানিক জবাবদিহির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তা ঘটানোর জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (RPO)-র অধ্যায় ৬ক (ধারা ৯০ক ও ৯০খ) সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধনে বাধ্য করতে হবে এবং নিবন্ধনের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি অধিকতর নির্দিষ্ট ও অনমনীয়

হতে হবে। আরপিও সংশোধন করার ব্যাপারে নাগরিক কমিটির হাতে পৃথক একটি বিবরণী তুলে দেওয়া হয়েছে; এখানে সে প্রসঙ্গে কী-কী বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

২০০৫ সালের মে মাসে প্রদত্ত হাই কোর্টের আদেশ মোতাবেক প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন সংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে তার শিক্ষাদীক্ষা, পেশাগত যোগ্যতা, আয়ের উৎস, বিগত ৩ বছরে কর প্রদানের প্রমাণাদি, তাঁর ও পরিবারের প্রত্যক্ষ সদস্যদের পুরো সম্পদের হিসাব, কোনো মামলার আসামী হয়ে থাকলে তার বিবরণ, ব্যাংক-ঋণখেলাপি হয়ে থাকলে সে-তথ্য, এবং দল বদলের পূর্ব-ইতিহাস যদি থাকে তাও নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। এ-সব তথ্যের সঙ্গে আরও যে-তথ্যাদি জানাতে হবে তা হল দলের তহবিলের উৎস ও যাবতীয় টাকাপয়সা লেনদেনের হিসাবপত্র। নির্বাচন কমিশনকে জনসমক্ষে এই তথ্যাবলি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যাতে ভোটদাতারা প্রার্থীদের সম্পর্কে আরও বেশি অবহিত হয়ে তাঁদের পছন্দসই প্রার্থী বেছে নিতে পারেন। কোনো প্রার্থী সম্পূর্ণ তথ্য যদি পরিবশন না করেন বা মিথ্যা তথ্য দেন, তাহলে তাঁকে হয় অযোগ্য ঘোষণা করা হবে নয়তো যদি তিনি ততদিনে ভোটে নির্বাচিত হয়ে গিয়েও থাকেন তখন ঐ নির্বাচন বাতিল বলে বিবেচিত হবে। আরপিও নির্দেশিত আচরণবিধি কোনো প্রার্থী পালন না করলে যে-শাস্তিভোগের বিধান আছে তা কঠিনতর করতে হবে এবং আচরণবিধির বরখেলাপকারীকে আইনে সোপর্দ করতে হবে। ঋণখেলাপি, তাঁর জামিনদার ও পোষ্য—যাঁরা ভরণপোষণের জন্য তাঁর ওপর নির্ভরশীল—এবং দণ্ডিত অপরাধী সবাই নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হবেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অন্ততপক্ষে ৩ বছর অতিবাহিত না হলে কোনো সরকারি আমলা বা সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি পাবেন না। নির্বাচিত সকল প্রার্থীকেই নির্বাচনপরবর্তী ৪ বছর ধরে প্রতি বছরই তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে, নির্বাচন চলার সময়ে ও পরে সরকারি বৈদ্যুতিন বা প্রচার মাধ্যমের ওপর কোনোরকম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চলবে না। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী ৬ মাস যতদিন-না নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নির্বাচন তদারকিতে নিয়োজিত আমলাবৃন্দ পুরোপুরিভাবে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। কর্তব্য পালনে কোনো রকম অবহেলা বা দোষত্রুটির জন্য কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের অধিকার নির্বাচন কমিশনের থাকবে। নির্বাচনী আচরণবিধিকে একটি আইনে পরিণত করতে হবে, যাতে করে নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করে দেবার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকে। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে হাই কোর্টের অতিরিক্ত বেঞ্চ বসাতে হবে। তা করতে হলে Privilege Act for MPs (সংসদ সদস্যদের অধিকার আইন) প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করতে হবে।

আরপিও সংশোধন করে 'না-ভোটে'র সুযোগ রাখতে হবে। এর কারণ হল নির্বাচনে ভোটপ্রার্থীদের কাউকেই কোনো ভোটার ভোট দিতে নাও চাইতে পারেন। যদি এই 'না' ভোটের পরিমাণ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে নতুন মনোনয়নের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন আহ্বান করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। জাল ভোট বন্ধ করার জন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভোটার তালিকার কম্পিউটারকৃত ডাটা বেইজ প্রস্তুত করতে হবে এবং নতুন ভোটারের সংযুক্তি ও মৃত ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ

আরপিও সংশোধন করে 'না-ভোটে'র সুযোগ রাখতে হবে। এর কারণ হল নির্বাচনে ভোটপ্রার্থীদের কাউকেই কোনো ভোটার ভোট দিতে নাও চাইতে পারেন। যদি এই 'না' ভোটের পরিমাণ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে নতুন মনোনয়নের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন আহ্বান করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর ডাটা বেইজ পর্যালোচনা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রত্যেক ভোটারকে প্রদান করবে। এ ছাড়া নাগরিকদের নিবন্ধন করার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে পারলে ছবিসহ পরিচয়পত্রগুলো নির্বাচনের সময়েও ব্যবহার করা যাবে।

১.৩ একটি স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রচারে অর্থ জোগানোর ব্যবস্থা

কোনো সর্বসম্মত ফর্মুলার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা দান করতে হবে এবং তজ্জন্য জাতীয় বাজেটে নির্বাচনী প্রচারের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। দল নিজেদের অর্থও খরচ করতে পারবেন, কিন্তু ব্যয়ের এক সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করতে হবে। কোনো দল জনগণ বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে যে-চাঁদা তুলবেন তার অডিট সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য করে সম্পন্ন করতে হবে। চাঁদা গ্রহীতাদের নির্বাচন বাবদ ব্যয় নির্বাচন কমিশন তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবেন। নির্বাচন প্রচারণার ব্যয় কমানোকে বাধ্যতামূলক করে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়, যেমন—যৌথ সভা, একটি নির্বাচনী এলাকার সব কজন প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য সংবলিত একটিই মাত্র সাদা-কালো পোস্টার ইত্যাদি। জনগণের অর্থে পরিচালিত এ জাতীয় নির্বাচনপদ্ধতির লক্ষ্য হল—নির্দেশিত অর্থব্যয়ের তোয়াক্কা না করে ভোটপ্রার্থীরা প্রচারের পেছনে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ঢালার এবং নির্বাচনে জয়লাভ করলে কোনো পদে আসীন হওয়ার সুযোগ খাটিয়ে প্রচারণী ব্যয় মুনাফাসহ উঠিয়ে নেওয়ার যে সংস্কৃতি বর্তমানে চালু হয়েছে তা নির্মূল করা। সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য অডিটের বিধান রেখে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে; এর ফলে স্বচ্ছ ও পেশাদারি ভিত্তিতে দলগুলো তাদের সংগঠন ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও পর্যবেক্ষণ করা হবে।

১.৪ শিষ্টজনোচিত ও চিন্তাশীল মতবিনিময় এবং তর্কবিতর্কমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক দলগুলো সর্বসম্মতভাবে এমন এক 'আচরণবিধি' মেনে চলবেন যাতে সংসদে পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে সকল দলই তর্কবিতর্ক করতে পারেন। মুখোমুখি সংঘাতময় জনপথের রাজনীতির বদলে তাহলে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কনির্ভর রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে; তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামোয় উৎসাহ-উদ্দীপনা চাঙ্গা রাখার যে-ধরন রয়েছে সেখানেও পরিবর্তন আসবে। অর্থবল আর পেশিশক্তির ওপর নির্ভর না করায় রাজনৈতিক দলগুলো তখন বুদ্ধিদীপ্ত ও যোগ্য মানুষজনকে আকর্ষণ করতে পারবে। নির্বাচনে পরাজিত হলে আজকাল আর্থিক ক্ষতির যে ঝুঁকি থাকে তাও তখন অনেক কমে যাবে। জনস্বার্থের অনুকূলে কাজ করার দায়বদ্ধতা নিয়ে সৎ, নিবেদিতপ্রাণ ও যোগ্য রাজনীতিবিদগণ এর ফলে জাতীয় সংসদে তাঁদের উপস্থিতি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

১.৫ একটি কার্যকর সংসদ, এবং দায়বদ্ধ সাংসদবৃন্দ

জনসাধারণের নিকট জবাবাদিহির রক্ষাকবচ হিসেবে সংসদ কাজ করবে। সংসদে নির্বাচিত সাংসদবৃন্দের মূল দায়িত্ব হবে আইন প্রণয়ন করা এবং সরকারকে জবাবদিহিতে বাধ্য রাখা। সাংসদগণ তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সংসদে নিজের এলাকার সমস্যাদি উত্থাপন করবেন। স্থানীয় নির্বাচিত সরকারের নির্দেশনাতেই অবশ্য এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। সংসদে সদস্যপদ হারাবার ঝুঁকি ছাড়াই সাংসদগণ সকল ব্যাপারে (অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের মতো নির্ধারিত গুটিকয়েক ক্ষেত্র ব্যতিরেকে) ভোট দেওয়া বা না দেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এজন্য অবশ্য সংবিধানের ৭০ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। স্পিকার এবং একজন ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত) সংসদের অভ্যন্তরে তর্কবিতর্কে যেন শাসক দল ও বিরোধী দলের সাংসদগণ অংশগ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করবেন। স্পিকার ও

ডেপুটি স্পিকার (দের) নিজ নিজ দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে। ফলে, সংবিধানের ৭০ ধারা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে সহায়তা করবে কার্যকর একটি সচিবালয়, সেজন্য যথাবিহিত অর্থবরাদ্দ থাকবে যাতে করে সেবা দানের জন্য বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের এবং সংসদে উপস্থাপিত বিল ইত্যাদির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের সুযোগ থাকে।

আইন প্রণয়ন ব্যতিরেকে সাংসদগণ সংসদীয় কমিটিগুলোর মাধ্যমে সরকারি নীতিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবেন। সকল সংসদীয় কমিটিতে বিরোধীদলীয় সাংসদের আনুপাতিকভাবে প্রতিনিধিত্ব থাকবে; তার ফলে কার্যকর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে, এবং সরকারি হিসাব কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোসহ অন্ততপক্ষে অর্ধসংখ্যক কমিটিতে প্রধানের পদ গ্রহণের জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সংসদে প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই এই সব কমিটি গঠন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে। সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দেওয়ার জন্য কমিটিগুলো বাইরে থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষজ্ঞ এনে নির্ধারিত শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। মন্ত্রীরা যাতে অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি হতে পারেন তার বিধান রাখতে হবে। সাংসদগণ ঋণখেলাপ, কর ফাঁকি দেওয়া, বিচারাধীন দুর্নীতিমামলার কারণে এবং তাঁর এলাকাবাসীর আস্থা হারালে 'প্রত্যাহার' ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাবে। ভ্রমণের জন্য সরকারি তহবিলের অপব্যবহার ও অযাচিত সুযোগ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। যেমন, নিজের নির্বাচনী এলাকায় দলবলসহ সরকারি খরচে মন্ত্রীদের যাতায়াত সংযত করতে হবে, বছরে যেন বার ছয়েকের বেশি ভ্রমণ না হয় তা দেখতে হবে। সংসদে সওয়াল-জবাবের নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ বহাল থাকবে এবং বিরোধী দল কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নমালাকে অগ্রাধিকার সেই দিনই দিতে হবে যেদিন বিরোধী দলনেতা সংসদ অধিবেশনে আইনানুগভাবে উপস্থিত থাকতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বসহ নাগরিক-স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল আলোচনা-সংবলিত সংসদ অধিবেশন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

১.৬ সংসদে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা সাংসদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন

পরবর্তী সংসদে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে সংসদে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং সংসদে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। লক্ষ্য থাকবে, ২০২১ সাল নাগাদ সংসদে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব অন্তত ৫০% নিশ্চিত যেন করা যায়। অন্যপক্ষে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নির্বাচনী এলাকার অন্ততপক্ষে ৩৩ শতাংশ (২০২১ নাগাদ এই সংখ্যা ৫০% পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে) স্থানে যাতে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয় তা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১.৭ তথ্য-অধিকার আইনের ব্যাপক প্রয়োগ

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এক মৌলিক লক্ষণ হিসেবে অবাধ তথ্যপ্রবাহকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সংসদে তথ্য-অধিকার আইন পাশ করতে হবে। সকল জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা তাঁদের সম্পদের খতিয়ান নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে দাখিল করার ব্যাপারে এই আইন নিশ্চয়তা দেবে। এ ছাড়া যে-কোনো সরকারি লেনদেন অথবা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা যাতে ঐ সংক্রান্ত তথ্য প্রচারমাধ্যমসহ নাগরিকবৃন্দকে জানাতে বাধ্য থাকেন সে-বিষয়টিও এ আইন নিশ্চিত করবে।

লক্ষ্য হবে, ২০২১ সাল নাগাদ প্রশাসনে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা নিয়ে আসা। তার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা ও অপরাধ তদন্তের তথ্য ছাড়া সব রকম সরকারি আর্থিক লেনদেন ও নথিপত্র বিষয়ক তথ্যাদি বৈদ্যুতিন পন্থায়

নাগরিকদের নিকট সহজপ্রাপ্য হবে; তা ছাড়া স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় ও সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন কর্মকর্তাদের আর্থিক ও রাজস্বসংক্রান্ত অবস্থানও তা থেকে জানা যাবে।

১.৮ স্বাধীন, দক্ষ, বিকেন্দ্রীকৃত, দুর্নীতিমুক্ত এক বিচারব্যবস্থা

আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটদের দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়—বিচার ও প্রশাসন; এবং তাঁরা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়সমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকেন। এর ফলে তাঁরা যখন বিচারের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে যান তখন প্রায়শই প্রশাসন বিভাগের আজ্ঞাবহ ও প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা ক্রমবর্ধমানভাবে খর্বিত হচ্ছে এবং কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের কার্যকারিতা এতে ধ্বংস হয়। বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সব রাজনৈতিক দলই ভোটদাতাদের কাছে প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগকে পৃথক্‌করণের অঙ্গীকার করে আসছে। পর পর তিনটি নির্বাচিত সরকার এই অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আগামী সংসদের প্রথম কর্তব্য অবশ্যই হওয়া উচিত সংবিধানের ২২নং ধারা মোতাবেক ও সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ মান্য করে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে ফেলা।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন করাটাই নিম্ন আদালতসমূহের কাজকর্ম উন্নত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। তার জন্য দরকার হবে ম্যাজিস্ট্রেটদের ও আইনজীবীদের উন্নততর প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি বিচারপ্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থা চালু করা।

অধিকন্তু গ্রামাঞ্চলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাক-সালিশ আদালত (pre-trial courts) ব্যবস্থা প্রচলন করে গ্রামবাসীদের জন্য বিকল্প বিবাদভঞ্জন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। সে কাজের জন্য এলাকাবাসীদের নিকট যাঁরা সম্মানিত—যেমন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল হেডমাস্টার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে বেছে নিতে হবে।

উচ্চ আদালতও ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় নিয়োগের মাধ্যমে এমনকি সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত রাজনীতিকরণের শিকারে পরিণত হচ্ছে। উচ্চ আদালতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনো প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো সম্ভব না হয় সেরকম একটি ব্যবস্থা উচ্চ আদালতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে তুলতে হবে। কোনো বিচারপতি যদি কোনো বিচারকার্য শুনানিতে বিব্রতবোধ করেন, তাহলে বিব্রতবোধের কারণ নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্টকে গ্রহণ করতে হবে। এটিকে পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১.৯ মানবাধিকার রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান ও আইনের শাসন

সংবিধানের ৩য় ভাগে নাগরিকবৃন্দের মৌলিক অধিকারের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে, জনগণ যেন সে-সব ভোগ করতে পারেন তার রক্ষাকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক। যেমন ২৭নং ধারায় বলা হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং প্রত্যেককেই আইন সমভাবে রক্ষা করবে। ২৮নং থেকে ৪৪নং ধারায় নাগরিকদের অন্য সব অধিকার সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাকে এককথায় 'নাগরিক অধিকার আইন' (Bill of Rights) হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত বিবাদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাক-সালিশ আদালত (pre-trial courts) ব্যবস্থা প্রচলন করে গ্রামবাসীদের জন্য বিকল্প বিবাদভঞ্জন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। সে কাজের জন্য এলাকাবাসীদের নিকট যাঁরা সম্মানিত—যেমন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল হেডমাস্টার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে বেছে নিতে হবে।

এ সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের আইনগত সাংবিধানিক সুযোগ কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি পদক্ষেপ হল, জনগণের পক্ষ থেকে সুবিচার ও মানবাধিকার প্রাপ্তির দাবিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এটি হতে পারে জনসাধারণকে সাংবিধানিক সুযোগাদির ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে— যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে দৈনন্দিন ন্যূনতম কোন জনসেবা রাষ্ট্র দিতে বাধ্য তা সে জানতে পারবে। সরলীকৃত 'নাগরিক অধিকার আইন' যা প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যহ প্রাপ্য ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় সেবা নিশ্চিত করে এবং যা আমাদের সংবিধানে গৃহীত আদর্শমালার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত, তা বিস্তৃত পরিসরে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে যেন প্রতিটি নাগরিক তার অধিকার বিষয়ে জ্ঞাত হয়। সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে : ভদ্র জীবন যাপনের উপযোগী উপার্জনের অধিকার; ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিকার (right to food); মানসম্মত শিক্ষা লাভ ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকার; জান-মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার; বিশুদ্ধ পানীয় জল, অব্যাহত বিদ্যুৎব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য গ্যাস সরবরাহ, সুলভ্য টেলিফোন প্রাপ্তি, ভালো সড়কব্যবস্থা জাতীয় মৌলিক অবকাঠামোতে অধিকার; বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার; স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার; স্বাধীনভাবে দল গঠনের অধিকার; এবং আয়-উপার্জন, স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম বা জাতিসত্তা নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য একই আইনকানুন প্রয়োগের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় অধিকার অর্জন। সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক নাগরিক অধিকার বিষয়ে জনগণ সচেতন হলে, যে কোনো নাগরিক হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চের মাধ্যমে 'নাগরিক অধিকার আইনে'র কোনো বিচ্যুতির জন্য বিচার চাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন। স্বাধীন ও দক্ষ বিচারব্যবস্থা থাকলে তা নাগরিক অধিকার আইন বলবৎ করায় ও মানবাধিকার রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগবে।

১.১০ নির্দলীয় ও পেশাজীবীসুলভ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা

যে রাজনৈতিক দলই শাসনক্ষমতায় থাকুক না কেন জনপ্রশাসনের দায়িত্বভার সম্পাদনে নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত, জনপ্রশাসনব্যবস্থায় কাজকর্মের পরিমণ্ডল এমন হতে হবে যেন রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিচারব্যবস্থা পরিচালনা ও তার সহজপ্রাপ্যতা এবং উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার রাজনৈতিক পক্ষপাত না থাকে। নির্দলীয় প্রশাসনব্যবস্থা তৈরির একটি পদ্ধতি হল—রাষ্ট্রীয় সেবায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগকে স্বীকৃতিদান ও পুরস্কার প্রদান।

১.১১ বর্ধিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি

সংসদের সকল সাংসদ ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত এক 'ইলেক্টরেল কলেজ'-এর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যিনি হবেন তাঁকে উন্নতমনা, খ্যাতিমান ও ব্যতিক্রমধর্মী চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে কিছু বর্ধিত ক্ষমতার অধিকার অর্পণ করতে হবে যেমন—সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের নিয়োগ দানের কর্তৃত্ব, সব ধরনের প্রশাসনিক কাজ যাতে পক্ষপাতহীনভাবে নিষ্পন্ন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা, সরকারি কর্মচারীর সুবিচার প্রার্থনার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং সকল সরকারি কর্মকাণ্ডের হিসাবনিকাশের প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে না নিয়ে সরাসরি হিসাবনিয়ন্ত্রক (Comptroller) ও মহাহিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে গ্রহণ করা ইত্যাদি। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে অন্তত কিয়ৎপরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভারসাম্য আরোপ করা সম্ভব হবে।

১.১২ সদাসতর্ক ও সক্রিয় সুশীল সমাজ

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে কার্যকরভাবে চালু রাখা যায় সে লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ ও চাপ সৃষ্টির কাজে সুশীল

সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসনের প্রয়োগ ও মানবৃদ্ধির দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত সে-সব রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তার তরফ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কার্যকর করানোর জন্য নির্দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাওয়াই সুশীল সমাজের উদ্দেশ্য। এর জন্য রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা-প্রক্রিয়া, বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে, অব্যাহত রাখায় সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দকে ব্যাপৃত থাকতে হবে। আয়-উপার্জন, ধর্ম, জাতিসত্তা, স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে জনগণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ যেন সুশীল সমাজের যাবতীয় উদ্যোগে নিশ্চিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সুশীল সমাজের সমুদয় কাজকর্ম স্বচ্ছ ও জনসমক্ষে প্রকাশ্য হতে হবে।

অভীষ্ট ২

একটি দক্ষ, জবাবদিহিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও বিকেন্দ্রীকৃত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র-প্রক্রিয়াকে টেকসই করার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হল—রাষ্ট্রপরিচালনার সকল কাজকর্ম চালু রাখা ও গণতান্ত্রিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান তৈরি আছে সেগুলো দক্ষভাবে পরিচালনায় সরকারের সামর্থ্য অর্জন। এর জন্য দরকার এমন এক স্থিরলক্ষ্য সরকার যার নীতিনির্ধারণী ও ফলপ্রসূ পরিচালনশক্তি সুদৃঢ় হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা থাকবে। দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকা বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আরও অধিক মাত্রায় পেশাদারি সংস্কৃতি গ্রহণ করাই হবে সরকারের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। তা মোকাবিলা করতে গেলে সরকারের সব রকম কর্মকাণ্ড সকলের দৃষ্টিগোচর করানো এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যেন সরকারের নীতিমালা ও কর্মতৎপরতা গ্রহণ করা যায় সে-উদ্দেশ্যে দেশের মানুষ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে ও নিরপেক্ষ নিয়োগদানের মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, নির্দলীয় এক আমলাতন্ত্র অপরিহার্যভাবে থাকতেই হবে। ২০২১ নাগাদ বাংলাদেশ কীভাবে পরিচালিত হওয়া প্রত্যাশিত সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিতে যে-সব বিষয় জরুরি সে-সব এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

২.১ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া

সুশাসনের জন্য জরুরি হচ্ছে নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-পদ্ধতি—যাতে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধতার মধ্যে সম্পর্কস্থাপন হয়। উন্নত নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হল সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জনমত। সে-ক্ষেত্রে প্রত্যাশা থাকবে সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেন সরকারকে দেশবাসীর মধ্যে নীতিমালা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে ও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার সকলের সামনে তুলে ধরতে জবাবদিহির চাপের মুখে রাখে। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, সে-সব নিয়ে তর্কবিতর্কসহ সংবাদমাধ্যমের মান বৃদ্ধি করে পেশাদারিত্বের আরও উন্নয়ন ঘটানো।

সরকারের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামতের যাতে যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে তা নিশ্চিত করতে সকল মন্ত্রণালয় তাদের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনা জানতে ও তাদের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তরদানের লক্ষ্যে যেন 'ওয়েব-ভিত্তিক নাগরিক ফোরাম' প্রতিষ্ঠা করে, তা দেখতে হবে। মন্ত্রণালয়গুলোকে আরও যা করতে হবে তা হল নিয়মিতভাবে 'নাগরিক শুনানি'র ব্যবস্থা করা, যেখানে শুনানিতে অংশগ্রহণকারী নাগরিকবৃন্দের প্রশ্নাদি ও নানা অভিযোগের উত্তর সংশ্লিষ্ট মহল সরবরাহ করবে। সংসদীয় কমিটিগুলোর কাছে সরকারি কর্মকর্তাগণ সব সময় জবাবদিহি করবেন। সংসদীয় কমিটির সভাগুলোতে সংবাদমাধ্যমের লোকজনকে উপস্থিত থাকতে দিতে হবে, এবং সংসদে উপস্থাপিত এ-সব কমিটির (বিশেষত সরকারি হিসাব কমিটির) প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সংসদীয় নিয়মবিধি (Parliamentary Rules of Procedures) সংশোধন করতে হবে। অবশ্য জাতীয় নিরাপত্তা ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য যে-সব সভা অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো জনসাধারণ ও সংবাদমাধ্যমের

এক্তেয়ারের বাইরেই থাকবে। নিয়মিত আলোচনা-পরামর্শ ইত্যাদির লক্ষ্যে সক্রিয় একটি উপদেষ্টা কমিটি সব মন্ত্রণালয়েই রাখতে হবে, এবং সে-কমিটিতে সুশীল সমাজ, বেসরকারি মহলের লোকজন ও পেশাজীবী বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিচারবিভাগ, সরকারি কর্ম ও নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিকভাবে স্থিরীকৃত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ সুচারুভাবে যাতে কার্যনির্বাহ করতে পারে তার জন্য এক যথোপযুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। এ-সব নিয়োগ হতে হবে মর্জিনিরপেক্ষভাবে এবং তাতে যেন ব্যতিক্রমহীনভাবে উঁচু মানের নৈর্ব্যক্তিকতা ও স্বচ্ছতা থাকে; কারণ, লক্ষ্য হল এমন ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া যাঁদের উচ্চ সামাজিক অবস্থান ও বিশিষ্টতা নিয়ে সকলেই একমত এবং নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে যাঁদের গণ্য করা হয়।

২.২ স্বচ্ছ ক্রয় নীতিমালা

জাতীয় ক্রয় নীতিমালা (Public Procurement Law) যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকর করতে হবে, এবং বাজেট বরাদ্দের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা তৈরির সুযোগের ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। সামনের বছরগুলিতে সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমকে ক্রয় ব্যবস্থার পরিবীক্ষণে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যাতে আইনের বরখেলাপের ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় ও দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দক্ষ ব্যবহার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে একটি ই-ক্রয় সংস্কৃতি প্রচলনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যাপক ব্যবহার চালু করা গেলে মাঝামাঝি পর্যায়ে প্রহরাদায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানাদির প্রয়োজন কমানো যাবে। যেমন ধরা যাক, দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র ওয়েবসাইটে দেওয়া ও সেগুলো ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই জমা দেওয়া। এর ফলে অযথা বিলম্ব ব্যতিরেকেই কাগজপত্রের ঝঞ্ঝাট ও কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াই সরকার ও দরপ্রস্তাবকগণ তাদের কাজ নিষ্পন্ন করতে পারবে। সে অবস্থায় ফলপ্রসূ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ও যোগসাজসপ্রসূত দরপত্রের যে-রেওয়াজ চালু আছে তা বহাল থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দরপত্রের প্রতিযোগিতায় জয়ের ফলাফল ও তার পশ্চাদ্‌বর্তী কারণাদি জনগণের সামনে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করাও যাবে।

২.৩ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক প্রচলন

ক্রয় প্রক্রিয়ার উন্নতি বিধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার ছাড়াও, যদি ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক প্রচলন করা যায় তা হলে আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয় উন্নত করা যাবে এবং দক্ষতাও বাড়ানো যাবে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে এবং একই সংস্থার ভেতরেও যোগাযোগ রক্ষা ও তথ্য আদানপ্রদান উন্নত করার জন্য স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য সরকার ই-মেইল ব্যবহার চালু করবেন। মধ্যমেয়াদী সময় ধরে সরকারের সকল অফিস ও জনসেবাকর্মের সংবাদাদি অন-লাইনে সকলে জানতে পারবেন, তার ফলে দুর্নীতির সুযোগ যেমন কমে আসবে তেমনই সরকারি কাজকর্মে দক্ষতা বাড়বে, স্বচ্ছতা আসবে। যেমন, অন-লাইন ট্যাক্স সার্ভিস (করযোগ্য আয়, আয় অনুপাতে ধার্য করের হিসাব, আয়কর ফর্ম প্রভৃতি) চালু করা এবং কর জমা দেওয়ার কাগজপত্র অন-লাইনে প্রেরণ করা যদি যায় তাহলে কর আদায় ও কর সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটবে। সরকারি সেবা (যেমন—ট্রেড লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, নাগরিকত্ব নিবন্ধীকরণ, পেটেন্ট, জমি রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন কর-ফি-গণউপযোগ কার্যাদির বিল) পেতে হলে সাধারণ লোকজন ও ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যতটুকু সময় ব্যয় হয় তা অন-লাইন সার্ভিস চালু হলে অনেক কমবে। তথ্যপ্রযুক্তি (IT)-ভিত্তিক প্রশাসন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্ধারণ করে সেখানে সে-সব প্রয়োগ করতে হবে।

ই-গভর্নেন্সের সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের

প্রতিটি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইটি-বিপণি (kiosk) স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। সব পরিবার যেন ই-গভর্নেন্সের সুযোগ লাভ করে তা দেখতে হবে। আয়-উপার্জন নির্বিশেষে সকল নাগরিককে ই-গভর্নেন্সের বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হলে বিশাল জাতীয় উদ্যোগের প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু তাতে করেই ই-গভর্নেন্স যেমন সর্বজনীন হবে তেমনই জনসম্পদও তৈরি হবে।

২.৪ কার্যকর দুর্নীতিদমন কমিশন

দুর্নীতিদমন কমিশনে এমন ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিতে হবে যাঁদের জনগণের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং যাঁদের সততা সর্বজনস্বীকৃত। সাংবিধানিকভাবে স্থিরীকৃত স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে। বেসরকারি ও সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থার তদন্ত, *Suo Moto*, করার পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকবে। বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা ও সেশন জজেরা দুর্নীতিদমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। সর্বাধিক জরুরি হল—কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য প্রণোদনা জোগাতে উৎসাহদায়ক ভাতা-কাঠামোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। কমিশনে তার নিজস্ব উত্তমরূপে প্রশিক্ষিত তদন্তকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ থাকবেন যাঁদেরকে বিভিন্ন সার্ভিস (যেমন পুলিশ, আয়কর ইত্যাদি) থেকে নিয়ে আসা হবে এবং তাঁরা সম্পূর্ণত কমিশনের নিকটই জবাবদিহি করবেন।

২.৫ দরিদ্রমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেটের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

বাজেট প্রণয়ন করতে হবে জনগণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যাতে করে এমনকি দেশের সুযোগসুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা বাজেট তৈরিতে তাঁদের অধিকারের বিষয় যুক্ত করতে এবং বাজেট বাস্তবায়নের সুবিধা ভোগ করতে পারেন। সরকারি হিসাব (Public Accounts) যেন স্বচ্ছ ও যথাবিহিতভাবে অডিট করা হয় তা দেখতে হবে। সে-ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সমাজের সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের (বিশেষভাবে যাঁরা প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা) মধ্যে প্রাক-বাজেট মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। সুশীল সমাজ যাতে বাজেট তৈরি প্রক্রিয়ায়, বিশেষত বাজেটের ব্যয় নির্বাহ, সেবাদানের মান, বাজেটের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে নিজেদের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পান সেই সুযোগ রাখার জন্য স্তরবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে হবে। সরকারি অফিস-আদালতের পাশে একটি বোর্ড ঝুলিয়ে তাতে যদি বাজেটে আয় কত আর কোন কোন খাতে কত ব্যয় সে-সব লিখে দেওয়া হয়, তা হলে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগোনো যাবে। বাজেট চূড়ান্ত করা ও সংসদে পূর্ণকক্ষ অধিবেশনে পেশ করার পূর্বে তা পর্যালোচনা করার সুযোগ সংসদীয় কমিটির থাকবে এবং বাজেট বাস্তবায়নের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনাও তাকে করতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ যে অভীষ্ট নির্ধারিত হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হলে বাজেট তৈরি করতে হবে তৃণমূল পর্যায়সহ ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে; একইসঙ্গে সকল সরকারি ব্যয় যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে হয় এবং বাজেটে যে নির্দিষ্ট ফলাফল প্রত্যাশা করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তাও দেখতে হবে।

২.৬ স্বাধীন বাংলাদেশ ব্যাংক

সাধারণভাবে অর্থ সরবরাহ, ঋণলাভের আনুষঙ্গিক খরচা (cost of credit) ও মুদ্রাব্যবস্থাপনা যাতে জাতীয় সামষ্টিক অর্থনীতির (macroeconomic) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। টাকার মূল্যমানের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যাংকারের যে ভূমিকা এই ব্যাংক পালন করে আসছে তা অব্যাহত থাকবে। মুদ্রানীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃত্ববহনকারী

সরকারের ব্যাংকার ও অর্থনৈতিক উপদেশক হিসেবে এই ব্যাংক সেবা প্রদান করবে। সে-ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে গেলে, বিশেষত সরকারপক্ষ থেকে অর্থনৈতিক নিয়মানুবর্তিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন (রাজনৈতিক ও কায়েমি স্বার্থের বিভিন্ন দলের প্রভাব থেকে মুক্ত) দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে অতি অবশ্যই বেসরকারি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

২০২১ সাল নাগাদ মুদ্রানীতির লক্ষ্য হবে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে সকল নাগরিক যেন ঋণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। সকলেই ক্ষুদ্রঋণ পাচ্ছে, এটুকু নিশ্চিত করলেই হবে না; সাধারণভাবে চালু যে-সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক প্রবাহ শহরের অধিকতর সংগঠিত অংশ ও সম্পদবঞ্চিত গ্রামীণ অংশ উভয়দিকেই যেন যায় সেটাও দেখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা, ২০২১ সাল নাগাদ, পুনর্বিন্যস্ত করে সঞ্চয়ের ব্যবস্থাদি ও ঋণসুবিধার ব্যাপক বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

২.৭ দক্ষ, স্বচ্ছ ও গণবান্ধব ভূমি-প্রশাসন ব্যবস্থা

ভূমি-প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক, জটিলতামুক্ত, কম দুর্নীতিযুক্ত ও গণবান্ধব এবং স্থানীয় সরকারের অধিক নির্ভরযোগ্য সংস্থাগুলো অন-লাইনে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করবে ও সেগুলোকে নিয়মিত হালনাগাদ করবে। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি রাজনৈতিকভাবে বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় সরকার উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। জমি মালিকানার সার্টিফিকেট মালিকানাভিত্তিক জমি রেকর্ডের সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। একইভাবে উপজেলা ধরে ধরে তফসিলভুক্তির জরিপ ও জমির ওপর অধিকার নির্দিষ্ট সময়মাফিক নথিবদ্ধ করার মাধ্যমে সমস্ত জমির মালিকানা-নথিপত্র হালনাগাদ করতে হবে। জরিপের ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ বিষয়েও ভবিষ্যতে যথাসময়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। মেয়েরা যেন বাবা-মায়ের ও স্বামীর কাছ থেকে জমির ও অন্যান্য বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার পরিপূর্ণভাবে পায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসী জনগণ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও যাতে উত্তরাধিকার ও পূর্বপুরুষের জমিজমার ওপর অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে।

২.৮ একটি বিকেন্দ্রীকৃত ও উন্নত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

একটি বিকেন্দ্রীকৃত ও উন্নত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলোকে সত্যিকার অর্থে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এতদুদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধিতহারে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে; তার ফলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজস্ব-সম্পদ কেন্দ্রীয়ভাবে সংহত করে তাতে নিশ্চিত অংশপ্রাপ্তিসহ স্থানীয় সরকারের কাজকর্ম, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করে একটি উন্নত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন অংশকে ক্ষমতা দেওয়া হবে, সে যেন তার নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে; অবশ্য কার্যকর

২০২১ সাল নাগাদ মুদ্রানীতির লক্ষ্য হবে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে সকল নাগরিক যেন ঋণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। সকলেই ক্ষুদ্রঋণ পাচ্ছে, এটুকু নিশ্চিত করলেই হবে না; সাধারণভাবে চালু যে-সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক প্রবাহ শহরের অধিকতর সংগঠিত অংশ ও সম্পদবঞ্চিত গ্রামীণ অংশ উভয়দিকেই যেন যায় সেটাও দেখতে হবে।

জবাবদিহি ব্যবস্থা সেখানে থাকবে, নিয়মিত হিসাবনিরীক্ষা ও আয়ব্যয় ব্যাপারে প্রতিবেদন জমা দেওয়া যার অন্তর্গত। এসব দায়িত্ব নির্বাহে স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহের যাতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি হয় সেজন্য উদ্যোগ নিতে হবে। স্থানীয় সরকারের কোনো কাজকর্মে কোনো রকম সম্পৃক্তি সংসদ-সদস্যদের রাখা চলবে না। বাজেট প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অংশগ্রহণভিত্তিক হতে হবে এবং সুশীল সমাজের অন্তর্গত স্থানীয় মানুষজন তার নিয়মিত তদারকি করবেন। স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

২.৯ বিশ্বাসী, বিকেন্দ্রীকৃত ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী

আমরা চাই, জনগণের সেবা করবে এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মান উন্নয়নে আকাঙ্ক্ষী হবে এমন একটি পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠুক। এ ধরনের বাহিনীর কাছে আমাদের আশা থাকবে— তাঁরা সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখা, আইনের প্রয়োগ, শান্তি রক্ষা, মানুষকে ভীতিমুক্ত রাখা, সমাজের দুর্বল অংশ (যেমন—নারী, সংখ্যালঘু, বয়স্ক, অনাথ মানুষজন) সমেত সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করাই হবে পুলিশ প্রশাসনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য অবশ্যই যেন নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, কেননা নাগরিকের জান-মাল রক্ষা ও আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ তার ফলেই সম্ভব হবে। আইনভঙ্গকারীদের দমন ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন এই উভয় প্রক্রিয়াতে অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। সমাজে সচরাচর যে-সততা লোকজনের নিকট থেকে আশা করা যায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে তার চেয়ে বেশি সৎ হতে হবে, কারণ তাঁদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা সে-রকমই।

সমাজের সকল স্তরে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে সকল নাগরিকের নিকট সহজলভ্য হতে হবে, পুলিশ প্রশাসনকে জেলা পর্যায়ে স্বাধীন পুলিশ বাহিনী (জেলাকেন্দ্রিক ইন্সপেক্টর জেনারেলদের অধীনে) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। প্রত্যেক পুলিশ বাহিনী জেলা স্তরে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সংস্থাগুলোর নিকট জবাবদিহি করবে, এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে তাকে অতি অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে দলনিরপেক্ষ থাকতে হবে। পুলিশ বাহিনীতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থাকতে হবে এবং তার সেবাগ্রহণকারী জনগণের ভেতরে তাকে নিয়ে গর্ববোধ সৃষ্টি করা দরকার; সেজন্য সারা দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ে তাদের মান নির্ণয় (rating) করার নিয়মিত ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ যতদিন-না স্থানীয় সরকার যাবতীয় পুলিশী কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ততদিন পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের অধীনে ন্যস্ত গ্রামীণ পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

আন্তঃজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অপরাধ মোকাবিলা করার জন্য একটি জাতীয় তদন্ত সংস্থা গঠন করতে হবে এবং তাকে বিশেষ ফরেনসিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।

সার্বিকভাবে পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কিছু ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা যায়। ৫৪নং ধারা বাতিল করা তেমন একটি পদক্ষেপ হবে। পুলিশ কী করতে পারে এবং পারে না তা যদি সব থানায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করা হয় তাহলে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তা আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রত্যেক গ্রামে ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেক ওয়ার্ডে ২০২১ সাল নাগাদ নাগরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিটি নিজ নিজ এলাকায় পুলিশ বাহিনীর অনবধানতাজনিত ত্রুটি শনাক্ত করবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে এবং শান্তিপূর্ণ ও আইন-অনুগত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ নাগরিক ও পুলিশের মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কায়েম করবে।

২.১০ স্থায়ী বেতন ও চাকুরি কমিশন

একটি স্থায়ী বেতন ও চাকুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকল স্তরে সরকারি প্রশাসনের কাঠামো (স্থানীয় সরকারসহ) অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা করা ও নিয়মিতভাবে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণদানের কাঠামোয় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা এই কমিশনের দায়িত্ব হবে। দলনিরপেক্ষভাবে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করে কমিশনটি গঠিত হবে।

অভীষ্ট ৩

একটি দারিদ্র্য-বিমোচিত মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়া

আমরা বিশ্বাস করি যে, ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যআয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার মতো সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি বাংলাদেশের আছে। আগামী পনেরো বছরে বাৎসরিক কমপক্ষে ৮ শতাংশ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-র প্রবৃদ্ধি হারের ওপর ভিত্তি করে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় মার্কিন ১ হাজার ডলারের (এখনকার ডলারমূল্য বিবেচনায়) কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারলে সেটা সম্ভবপর হবে। বিদ্যমান অবস্থান থেকে সরে গিয়ে প্রকৃত অর্থে উন্নতি ঘটাতে হলে প্রয়োজন এমন নীতি ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যাতে জনসংখ্যার সকল স্তর, বিশেষত যারা সম্পদহীন, প্রবৃদ্ধি হারের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে এবং সুফলের অংশভাগী হতে পারে।

আমরা সচেতন যে, মাথাপিছু যে-আয় আমরা অর্জন করতে চাই হিসেব করে দেখতে গেলে বেশির ভাগ দেশে জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ তা নিয়েও দারিদ্র্যসীমার নীচেই থাকছে। আয় বণ্টনে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যজনিত কারণে চূড়ান্ত ও দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন যে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং অথচ জরুরি, সে ব্যাপারেও আমরা সচেতন। মঙ্গাপীড়িত মানুষ, আদিবাসী, হরিজন ও ঋষি প্রভৃতির মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তো এখনও 'বিস্মৃত মানুষ' হিসেবেই রয়ে গেছে। দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান নিঃস্বীকরণ প্রক্রিয়া ও শিশুদের এক বড়ো অংশ দারিদ্র্যসীমার ভেতরে হওয়ায় কর্তব্য আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব চ্যালেঞ্জ যথাবিহিত মোকাবিলা করার কৌশল আবিষ্কার করাই আমাদের দায়িত্ব হবে।

আমরা এও বুঝি যে, অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাদির কর্মকাণ্ড সহায়-সম্পদহীনদের উৎপাদনক্ষমতাকে দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির সঙ্গে সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। আমরা চাই যে, এইসব সাক্ষাৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক ও সর্বব্যাপ্ত হোক; এর ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হবে। সমস্যা শনাক্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে সুবিধাবঞ্চিতদের সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে সমাধান খোঁজার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস হল—সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী নিজেদের অনেক সমস্যা নিজেরাই নিরসন করার ক্ষমতা রাখে। তার পরও কাঠামোজনিত অন্যায় আমাদের সমাজে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে বলে অর্থনীতির মূল প্রবাহ থেকে তারা বাইরেই পড়ে থাকছে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল এজাতীয় অন্যায়কে সংশোধন করা। তা যদি করতে হয় তাহলে দেশের সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের উন্নয়নের উৎপাদনশীল মাধ্যমে পরিণত করতে হবে যাতে করে উদ্যোক্তাসুলভ এক বিশাল শক্তি, উৎপাদনক্ষম শ্রমের উৎস ও সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে তাদের সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায়। আমাদের বর্তমান অর্জনকে পুঁজি করে কীভাবে আরও এগিয়ে যওয়া যায় এবং দ্রুত বিশ্বায়নমুখী দুনিয়ায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জকে কীভাবে আগামী ১৫ বছরে সামাল দেওয়া যায় সে-সব কর্মপন্থা নির্ধারণ আমাদের করণীয় কর্তব্য হবে।

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও পরিবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অংশ (যা ইতোমধ্যেই ১৫ শতাংশে নেমে এসেছে) নির্মাণখাত (manufacturing sector) ও সেবাখাতের (services sector) উর্ধ্বগতির প্রতিতুলনায় আরও পড়তির মুখে পড়বে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে অন্ন জোগাতে হলে কৃষির উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতেই হবে।

এই দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকৌশলে গ্যাস, কয়লা ও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার চাই।

দেশীয় বিনিয়োগকারীর প্রয়োজন মেটাতে ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সারা দেশে বিদ্যুতায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামুখী সুযোগসুবিধা ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের উন্নয়নকৌশলকে সহায়তা দানের জন্য যথোপযুক্ত ও সৃজনতৎপর নানা উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর বেসরকারি সঞ্চয় ও অধিকতর রাজস্ব আদায়সহ বৈদেশিক সম্পদ দেশে আহরণের মাধ্যমে এই ভারসাম্যভিত্তিক কৌশল কার্যকর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্র ও বাজারের আপেক্ষিক ভূমিকা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে যথাযথ ভারসাম্য ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সব কিছু ঠিকমতো শনাক্ত করতে হবে। বিগত বহু বছর যাবৎ সরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক সামর্থ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং শ্রমিকেরা ক্রমবর্ধমানভাবে নীতিজ্ঞানশূন্য হয়েছে। এই অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সরকারি খাতে ব্যয়—যা উন্নয়নশীল দেশের মানদণ্ডেও মোট দেশজ উৎপাদনের অংশ হিসেবে বেশ কম—দক্ষতা ও অধিকতর সম্পদ বরাদ্দের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করে বাড়াতে হবে। সরকারি কাজকর্মে নব নব ও সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ প্রয়োজন, যেমন—সরকারি খাতের যৌথ সংস্থায়ন (corporatization); সেখানে চাকুরিরতদের জন্য প্রণোদনার লক্ষ্যে নতুন কাঠামো তৈরি এবং যে-ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে ব্যবস্থাপনার বেসরকারীকরণ। শ্রমিকেরা ও নির্দিষ্ট আয়ের বিভিন্ন শ্রেণী যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানাদিতে ব্যাপকতরভাবে ইকুইটি শেয়ার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। জনসেবার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার সর্বোত্তম সমন্বিত কার্মোদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে। যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সংশোধনের বন্দোবস্ত রাখার মাধ্যমে নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতার আবহ প্রস্তুত করতে হবে; সে-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রাতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য যাতে বাড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সমাজের সহায়সম্পদহীন মানুষ উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় আকাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগী অংশ না হয়ে তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পাবে—এমন এক উন্নয়নকৌশল প্রণয়ন করতে গেলে সৃজনশীল নীতি ও সৃষ্টিশীল নানা প্রতিষ্ঠান দরকার হবে। আমাদের কর্মকৌশল হবে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিয়োগ কাজে লাগানো যাতে জনগণের (বিশেষত সম্পদহীনদের) অংশগ্রহণ ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। উন্নয়নপ্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়নের কিছু কিছু বিষয় এই রচনার ৪র্থ, ৫ম ও ৮ম অংশে আলোচিত হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ যাতে নিদারুণ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত ও বিশ্বে মধ্য-আয়ের প্রতিযোগিতামূলক একটি দেশে পরিণত হয় সেই লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির চারিত্র্য স্পষ্ট করার জন্য কতিপয় অতি জরুরি বিষয় এই অংশটিতে প্রধানত আলোচিত হয়েছে।

৩.১ কৃষিক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীলতা, বৈচিত্র্যীকরণ ও বাণিজ্যীকরণ

মানসম্মত গবেষণা, প্রসারণ, যন্ত্রনির্ভর কৃষিকর্ম ও শস্য বহুমুখীকরণে আরও বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে চাষযোগ্য জমি ক্রমশ কমতে থাকার মুখে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে প্রধান বিনিয়োগকারী হবে সরকারি খাত এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের মতো কৃষিখাতে প্রধান অর্থজোগানদার হিসেবে সে-ই কাজ করবে। মাইক্রো ফিনান্স প্রতিষ্ঠানাদির এক নতুন ধারা ছোটখাটো খামারকে ঋণ প্রদান করবে এবং নিঃসম্বলদের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে সাড়া দেবে। বাণিজ্যিকভাবে সফলতর ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে ছোট কৃষিখামারগুলোর উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও বেশি দামের শস্য ফলানো সম্ভব হবে। 'বিশেষ কৃষি অঞ্চল' (Specialized Agricultural Zone) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শস্য, ফলমূল, গবাদি পশু ও মৎস্য উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে। এইসব পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ ও সর্বশেষে বাজারজাত করার পর যাতে খুচরা বিক্রেতার হাতে পৌছায় ও রপ্তানি (সহজে নষ্ট

হওয়ার মতো দ্রব্যাদি বিশেষ কার্গো-বিমানে পরিবহণের সুবিধাসহ) করা যায় তার জন্য এই অঞ্চলগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা রাখতে হবে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের শস্য বৈচিত্রীকরণ ও পরিবহণের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্য যোজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে হবে। আশা করা যায়, সামনের বছরগুলোয় কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্মুক্ত হবে। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের সঙ্গে বিশ্ববাজারের সম্পর্ক স্থাপন বেশ একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। সরকারের পক্ষ থেকে যেমন দরকষাকষিতে দক্ষতা থাকতে হবে, তেমনই বিশেষায়িত ফিনান্সিং ও মার্কেটিং সংস্থাগুলোর উন্নয়ন ঘটিয়ে নবসৃষ্ট সুযোগসুবিধাদি কাজে লাগানোর ব্যাপারে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্ষম করে তুলতে হবে। অন্যদিকে, বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশকে নিশ্চিত করতে হবে যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র নিরিখে স্বল্পোন্নত দেশভুক্ত সদস্যদের খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়টি সুরক্ষিত আছে।

মাটির ক্রমক্ষয়িষ্ণু উৎপাদনশীলতা রোধ করে তার উৎকর্ষ সাধনকল্পে কৃষিতে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে, তা স্থানীয়ভাবে জৈব সারের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটাবে এবং কৃষিব্যবসাপ্রসূত শিল্পকারখানার একটা বড়ো অংশ তাতে নিয়োজিত হবে। জৈব সারে উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা অবশ্যম্ভাবী ধরে নিলে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ও প্রক্রিয়াজাত জৈব খাদ্যসামগ্রী আমাদের রপ্তানির একটা বড়ো অংশ হয়ে দাঁড়াবে। উপযুক্ত সেচব্যবস্থার অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্বল্পমেয়াদি সময়ে কার্যকর করা এবং নতুন ধরনের ও সৃষ্টিশীল জৈব খামার পদ্ধতির উপযুক্ত বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ-সেবা সহজপ্রাপ্য করা দরকার হবে। জৈব খাদ্যসামগ্রী নিশ্চিত করার জন্য, বিশেষত রপ্তানির লক্ষ্যে, ব্যবস্থাদি উদ্ভাবন করতে হবে।

৩.২ শিল্প ও সেবাখাতে দ্রুত উন্নতি

২০২১ সাল নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদনের এক বড়ো অংশ (প্রায় ৪০ শতাংশ) শিল্পখাত থেকে আসতে হবে, পাশাপশি কৃষিখাতের অবদান আরও কমে হয়তো ৮-১০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। অর্থনীতিতে এজাতীয় কাঠামোগত রদবদল দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যেমনটি পূর্ব-এশীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। যাহোক, এর জন্য সেবাখাত ও শিল্পখাত উভয়ক্ষেত্রেই অধিক মাত্রার উৎপাদনশীলতা দরকার হবে, সেইসঙ্গে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার অন্ন জোগাতে কৃষিখাতের সামর্থ্যও বাড়াতে হবে।

কৃষিসামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সাধারণ ম্যানুফ্যাকচারিংসহ শিল্পকারখানাকে উৎসাহ দান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে; আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, কৃষিখাতে গ্রামীণ মজুর শ্রেণীর কর্মসংস্থান যেখানে হচ্ছে না, সেখানে কাজের সুযোগ তৈরি হবে। ভবিষ্যতের শিল্পখাতের চেহারা কেমন হবে? একদিকে যেমন অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগসহ তৈরি পোশাক শিল্পখাত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, ওষুধ, চিনেমাটির বাসনকোসন, হাতে তৈরি পোশাক ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের প্রতিযোগিতাধর্মী অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন খাত উদ্ভাবন করতে হবে। নতুন রপ্তানিমুখী শিল্পের ভেতরে স্বর্ণলঙ্কার, হীরা কাটা ও পালিশ করা, সংযোজনকৃত বৈদ্যুতিন দ্রব্যাদি, ডাটা প্রসেসিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২০২১ সাল নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদনের এক বড়ো অংশ (প্রায় ৪০ শতাংশ) শিল্পখাত থেকে আসতে হবে, পাশাপশি কৃষিখাতের অবদান আরও কমে হয়তো ৮-১০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। ...এর জন্য সেবাখাত ও শিল্পখাত উভয়ক্ষেত্রেই অধিক মাত্রার উৎপাদনশীলতা দরকার হবে, সেইসঙ্গে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার অন্ন জোগাতে কৃষিখাতের সামর্থ্যও বাড়াতে হবে।

পরিবেশবান্ধব দেশসমূহে রপ্তানিবাজার খোঁজ করার উদ্দেশ্যে পাটশিল্পের নতুন সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বৃদ্ধিও এই শিল্পের কৌশল পুনর্বিন্যাসে প্রধান ভূমিকা রাখবে। নির্ধারিত খাতগুলোর (যার মধ্যে কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, জমির সার, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি পড়বে) জন্য সময় বেঁধে দিয়ে যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দানসহ একটি মধ্যমেয়াদি কৌশলগত বাণিজ্যনীতি গড়ে তুলতে হবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ববাজারের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগসুবিধা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যান্য খাত কী কী রয়েছে তাও খুঁজে বের করতে হবে।

দেশী বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ও রপ্তানিবাজার কাজে লাগানোর জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদনশীলতা বিকশিত করা ও বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই খাতের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা তৈরি করতে হবে। তার ফলে সরাসরি ঋণপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা, প্রযুক্তির উন্নতিবিধান, বাইরে থেকে আসা অর্থের সুবিধাদি নিশ্চিত করা যাবে। এগুলো করতে হবে সমন্বিত অবকাঠামো নির্মাণ করে; আন্তর্জাতিক ও দেশী বাজারে বেশি দরে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য অর্জনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এর ফলে সক্ষম হয়ে উঠবে।

পৃষ্ঠপোষকতার নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদির ফলে বিকাশমান অর্থনীতি নিয়ে সেবাখাত প্রসারিত হবে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানে যে-সব খাত মুখ্য অবদান রাখতে পারে তার মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য, পরিবহণ, এবং অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত পেশাদারি ও জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন সেবা পড়বে। যাতে উপযোগী নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে সেবাখাত বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগের পরিবেশ

বিনিয়োগ-পরিবেশের উন্নতি হল সবচেয়ে সোজাসাপটা এক রাস্তা, কিন্তু তার জন্য ভবিষ্যতের শিল্প ও সেবা খাতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার নিশ্চয়তা চাই। এর জন্য দুর্নীতিমুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অযথা হয়রানি থেকে মুক্ত, বিশ্বমানের উপযোগী সুষম মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও শ্রম-আইনের অস্তিত্ব, ই-মেইলে বিনিয়োগসম্পৃক্ত তথ্যসেবার ভেতর দিয়ে আমদানি-রপ্তানির সরলীকৃত নিয়মকানুন, উন্নত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মূলধন বাজারে (capital market) গভীরতা আনা এ সব করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও সেবা দান উন্নত করা—বিশেষত হাইওয়ে, বন্দর ও বিমানবন্দরে সুবিধা, টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎখাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে। বিনিয়োগ ও মাল পরিবহণ সহজ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে তৈরির ব্যবস্থা কতখানি যুক্তিসঙ্গত এবং/অথবা এই দুই নগরীর মধ্যে আরও আধুনিক রেলযোগাযোগ চালু করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিশদ সমীক্ষা করতে হবে। এইসব নব নব ও আধুনিকতামুখী বিনিয়োগের পশ্চাতে প্রশাসন-মানের পরিবর্তন দরকার সেবাদানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-মানকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই। এ-ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হতে পারে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত 'বিনিয়োগ-ঝুঁকি-মাত্রা'র সূচকে বাংলাদেশ যাতে ২০২১ সাল নাগাদ এশিয়ার সর্বোত্তম দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারে, সেটি নিশ্চিত করা। এ ধরনের লক্ষ্য পূরণ তখনই সম্ভব হবে যখন অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

৩.৪ বর্ধিষ্ণু বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবেশ

বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে পরিপূর্ণভাবে রপ্তানিবাজার ধরার জন্য উন্মুক্ত অর্থনীতিই বহাল রাখতে হবে। এতে এজাতীয় বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি সরবরাহের যোগ্যতা (যেমন বিশ্বাসযোগ্য অবকাঠামো, রপ্তানিতে অর্থায়নের প্রণালী, উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার, দক্ষ ও প্রযুক্তিমানসম্পন্ন মানবসম্পদের উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণে সর্বসম্মত মানের প্রয়োগ

ইত্যাদি) অর্জন ত্বরান্বিত হবে। উপযুক্ত অগ্রসংযোগ-সহায়তা দিতে পারলে বিশ্ববাজারে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রবেশাধিকার পাবে। প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য বিশেষ বাণিজ্য-কর্মীদল তৈরি করতে হবে যাতে তারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (Regional Trading Arrangements) ইত্যাদিতে জটিল আপস-রফায় অংশ নিতে পারে এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ পরিবীক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

৩.৫ বৈচিত্র্যমুখী রপ্তানির ভিত্তি ও বাজার

রেডিমেড পোশাক শিল্পের খাত ব্যতিরেকে রপ্তানিমুখী শিল্পে সুযোগ বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদনের প্রসরমাণ বিশ্বায়নের দুনিয়ায় আমাদের অবস্থান সুরক্ষিত করার প্রয়োজন আছে। যে-সব খাতে উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে পড়বে ওষুধ তৈরি, চিনেমাটির বাসনকোসন, হাতে তৈরি পোশাক, চর্মশিল্পজাত পণ্য, খেলনাসামগ্রী, সিমেন্ট, পাটের তৈরি প্যাকেজিং, মৃৎশিল্পজাত অলঙ্কার, সংযোজনকৃত বৈদ্যুতিন দ্রব্যাদি ও ডাটা প্রসেসিং। যাতে যথেষ্ট উন্নত মানের পণ্য প্রস্তুত করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা যায় সে-উদ্দেশ্যে উঁচুদরের ফ্যাশন ডিজাইন শিল্প গড়ে তুলতে হবে—তার কাজ হবে রপ্তানি শিল্পকে সহায়তা দেওয়া।

শক্ত-সমর্থ রপ্তানি উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে রপ্তানির নতুন নতুন গন্তব্যস্থল খুঁজে বের করতে হবে, যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোতে, কিংবা পূর্ব-ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে। তার জন্য বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বাণিজ্য-সম্প্রসারণ অফিস খুলতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ ভারত ও চীন বিশ্বে বৃহত্তম অর্থনীতির দুটি দেশ হিসেবে দেখা দেবে। ভবিষ্যতে এ দুটি দেশ আমাদের পণ্যের মূল রপ্তানি-গন্তব্য হবে। বাংলাদেশের সুযোগসম্ভাবনা অনুধাবনের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিশেষ ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণের ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে এ দেশসমূহে প্রকৃত বাজার শনাক্ত করা সম্ভব হবে। অভাবিতপূর্ব গতিতে সেবাদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে সেবা-খাতমুখী অর্থনীতিতে স্বাস্থ্যসেবা (উদাহরণস্বরূপ উন্নততর অর্থনীতির দেশে জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির নিরিখে যেমন নার্সের চাকরি) সমেত দক্ষ কর্মীদের জন্য সেবা রপ্তানি বহু সুযোগ তৈরি করবে। এইসব রপ্তানিসুযোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশকে যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

৩.৬ দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের সম্প্রসারিত বাজার

ভবিষ্যতে শিল্প সম্প্রসারণের অনেকখানিই আসবে বেসরকারি খাতের শ্রমিকনির্ভর উৎপাদন থেকে। যত বেশি মানুষের লাভজনকভাবে কর্মসংস্থান হবে, এবং/অথবা ইকুইটির মালিক হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা লভ্য ডিভিডেন্টে অংশ নিতে শুরু করবে, ততই তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এতে চাঙ্গা হবে। লক্ষ্য থাকবে যাতে প্রতিযোগিতাক্ষম দেশী শিল্প বিকাশের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়ে ওঠা এই অভ্যন্তরীণ চাহিদার একটা বড়ো অংশ মেটানো যায়; কারণ, ঐ শিল্পবিকাশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প উৎপাদনশীলতার উন্নতি ও প্রতিযোগিতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৩.৭ গ্রামীণ অ-কৃষিজ শিল্প ও সেবার ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলের বিকাশ

২০২১ সাল নাগাদ গ্রামীণ অ-কৃষিজ শিল্প বলতে বোঝাবে প্রাণচঞ্চল অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায়ী উদ্যোগ যারা প্রধানত দোকানদারি করার চেয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং করায় মন দেবে। গ্রামীণ অ-কৃষিজ খাতের বৃদ্ধির ফলে সক্ষম গ্রামীণ বিনিয়োগের পরিবেশ ও দক্ষ সেবা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। তার জন্য যে উদ্যোগগুলো নিতে হবে সেগুলো হল: গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যাপক প্রসার, দেশব্যাপী টেলি ও আন্তঃপরিবহণ যোগাযোগ; সুদৃঢ় গ্রামীণ অর্থায়ন পদ্ধতি; বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা;

এবং সরকারি সেবার বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রামীণ অ-কৃষিজ খাত বৃদ্ধি পেলে তার চৌহদ্দিতে ছোট ছোট শহুরে কেন্দ্র তৈরি হবে এবং তার ফলে মানুষের শহরমুখী দৌড়ঝাঁপ কমবে।

৩.৮ নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পরিব্যাপ্ত অর্থনৈতিক গভীরতা

প্রতিযোগিতামূলক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে সমভাবে দক্ষ ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। বেসরকারি ব্যাংকের বাইরে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদিকে গভীরতা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। কর্পোরেট বন্ড মার্কেট চাঙ্গা করা ও বিদেশী কোম্পানির শেয়ার ছাড়া সমেত পুঁজিবাজারকে উদ্দীপিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক শক্তিশালী ও স্বাধীন বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্পনীতির সমতাবিধায়ক অর্থনৈতিক নীতিমালা নিশ্চিত করবে। যদিও বেসরকারি খাতের ব্যাংক ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়, তবু সরকারি খাতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই উন্নততর কর্পোরেট পরিচালনমান অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ঋণ আদায়ের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং ঋণখেলাপীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং (যেমন ই-ব্যাংকিং, ATM-ব্যাংকিং, ফোন ব্যাংকিং প্রভৃতি) ব্যবস্থায় যথাসম্ভব বিচিত্রায়ন ঘটাতে হবে। ই-কমার্সের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। আগামী ১৫ বছরে গ্রামীণ অ-কৃষিজ খাতে প্রত্যাশিত বিস্তৃতি ঘটবে ধরে নিয়ে এজাতীয় আধুনিক ব্যাংকিং সেবার এক বড়ো সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হবে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে অর্থের জোগান দেওয়া। বৃহায়তন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী উদ্যোগের যে-বাজার রয়েছে তাতে আংশিকভাবে হলেও শামিল হতে পারে, অন্যদিকে তারা সামাজিক জামানত আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের ওপর ভিত্তি করে সৃজনমুখী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী উদ্যোগকে ঋণদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে বৈচিত্র্যমুখী ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরও সচলতার সঙ্গে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের সংস্থাসমূহ ঐ সঞ্চয় ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং দেশে প্রেরিত অর্থ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেবার মতো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যে তাদের রয়েছে সেকথা সুবিদিত।

৩.৯ দক্ষ শ্রমশক্তি

আমাদের অর্থনীতির বিকাশ ও কাঠামোগত রূপান্তর ও বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অভিবাসী শ্রমিকদের প্রসরমাণ চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে দক্ষ শ্রমশক্তির একটি ভিত্তি গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ন্যস্ত করতে হবে। সে-কারণে অল্প সময়ের ভেতরেই শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিনির্ভর ও সেবামুখী বিশ্বে জ্ঞানভিত্তিক শ্রমজীবীর চাহিদা যেমন বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দুটোর ওপরই সমভাবে জোর দিতে হবে, কারণ অল্প সময়ে দক্ষ শ্রমশক্তি আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যতের তথ্যসমৃদ্ধ সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামর্থ্য বজায় রাখতে বর্তমান শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি

শক্ত-সমর্থ রপ্তানি উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে রপ্তানির নতুন নতুন গন্তব্যস্থল খুঁজে বের করতে হবে, যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোতে, কিংবা পূর্ব-ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে। তার জন্য বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বাণিজ্য-সম্প্রসারণ অফিস খুলতে হবে।

ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ছাত্রবৃত্তি থাকায় বহু মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীর নিকট যেহেতু বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে, তাই শিক্ষাপদ্ধতিকে রাজনীতিমুক্ত করা অপরিহার্য কর্তব্য। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে (বিস্তারিত আলোচনার জন্য অভীষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য)।

৩.১০ দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমরপ্তানি থেকে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

উন্নত দেশগুলোয় বৃদ্ধবয়সীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আগামী বছরগুলোয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। এ-সব সমাজে বয়োভারানতদের স্বাস্থ্যসেবা, নার্সিং প্রভৃতির পরিসর ক্রমাগত এমনভাবে বাড়ছে যে, প্রযুক্তি দিয়ে সেই চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার বিরাট সংখ্যায় তরুণবয়সী স্বাস্থ্যকর্মীবাহিনী—যা বাংলাদেশ সরবরাহ করতে পারে। বিশ্ব জুড়ে সেবাখাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় শ্রম রপ্তানিতে বাংলাদেশ যথাযোগ্য স্থান পেতে পারে, যেমন—ডাটা এন্ট্রি, চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি তৈরি বা ঐ সংক্রান্ত পরামর্শের ভাষান্তর, হোটেলে ও হাসপাতালে সেবা দান ইত্যাদি কিছু বিশেষ ধরনের পেশায়। জ্ঞানভিত্তিক নানা শিল্পোদ্যোগে দক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত পেশাজীবী অব্যাহতভাবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার গড় লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে ২০২১ সাল নাগাদ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় বেশি না হোক, অন্তত কাছাকাছি যেন থাকে। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোর কাজে লাগাতে হবে। একইসঙ্গে অভিবাসী শ্রমজীবীর সঞ্চিত অর্থ যাতে (দ্রুত প্রসরমাণ কর্পোরেট খাতে শেয়ার কেনা সমেত) বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম সম্পদ আহরণের জন্য ব্যবহৃত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশী বাজারে দক্ষ সেবাখাতের ঊর্ধ্বমুখী প্রয়োজনীয়তাকে অবদমিত না করেই রপ্তানিযোগ্য সেবাখাত তৈরি করা যায়, এবং সে-ক্ষেত্রে এই বহিরাগত বৈদেশিক মুদ্রা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে দরকার হবে এক বিশাল ও বাজারমুখী বিনিয়োগ।

অভীষ্ট ৪

স্বাস্থ্যসম্পদময় একটি জাতিতে পরিণত হওয়া

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে দেশবাসীর সুস্থ-সবল থাকার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিগত ৩৫ বছরে জনগণের স্বাস্থ্যপরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। গড় আয়ু বেড়েছে, বছরে প্রতি এক হাজার শিশুজন্মের বিবেচনায় মৃত্যুহার [Crude Death Rate (CDR)] অনেকটা কমের দিকে এবং জন্মহার [Total Fertility Rate (TFR)] আশাতিরিক্তভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবু, এ-সব উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ব্যাপারে আরও বহু কিছু করার আছে। এই অঞ্চলের হিসেবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা এবং ডাক্তার-নার্স কি নার্স/দাই-প্রসূতির অনুপাতহার সবচেয়ে কম। এমনকি শ্রীলঙ্কার এখনকার স্বাস্থ্যপরিস্থিতির মানেও যদি বাংলাদেশ পৌঁছাতে চায়, তাহলে এক লাখ মানুষের জন্য যত ডাক্তার রয়েছে তার সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে আর নার্সের সংখ্যা হতে হবে চারগুণ। রোগবালাই বা অপঘাতজনিত কারণে মৃত্যুহার, বিশেষত শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুহার, এখনও এতখানি বেশি যে মেনে নেওয়া যায় না। জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্যমান এখনও যথেষ্ট নীচুতে রয়ে গেছে, এবং সাধারণ অনেক অসুখবিসুখের পেছনে বড়ো একটা কারণ হল দারিদ্র্য। কম ক্যালরির খাবার খেতে-খেতে তারা অপুষ্টির শিকার, বিশেষত নারী ও শিশু তো বটেই। এদেশে মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রধান দশটি অসুখের মধ্যে এখনও সেসব ছোঁয়াচে রোগগুলোই জায়গা করে আছে, যা আসলে প্রতিরোধযোগ্য।

এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল বিত্তবান এবং সহায়সম্পদহীন দুর্ভাগাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবামানের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের এলিট শ্রেণী বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারেন, কিংবা বাংলাদেশেও এখন বেসরকারিভাবে যে-সব অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত হয়েছে সে-সবের আশ্রয় নিতে পারেন। সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান, এন্ডোস্কপি ইউনিট ইত্যাদি রোগনির্ণয়ের আধুনিক যে-সব পদ্ধতি ও চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সে-সব ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনাকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে বেসরকারি খাতে চিকিৎসা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই প্রবণতা এমনি ধারায় চলতে থাকবে যার ফল দাঁড়াবে একটাই— কেবল স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেই নয়, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার সুযোগের ক্ষেত্রেও এলিট শ্রেণী ও কম সৌভাগ্যবান (বিশেষত গ্রামের লোকজন) যাঁরা তাঁদের মধ্যকার বৈষম্য প্রকট হতেই থাকবে। আমাদের জন্য মোক্ষম চ্যালেঞ্জ হল সম্পদহীন মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর রাস্তা খুঁজে বের করা। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সম্পদের প্রচণ্ড অপ্রতুলতা রয়েছে ধরে নিয়েই এই সেবাখাতগুলো মুখ্যত রাষ্ট্রেরই পরিচালনা করা দরকার। তা করতে হলে প্রয়োজন পড়বে গণস্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা আর তার লক্ষ্য হবে সহায়সম্পদহীন মানুষজন। সেই পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকৃত, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোয় উপযোগী ও সৃজনশীল হতে হবে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর তথ্যসরবরাহ পদ্ধতির চূড়ান্ত ব্যবহারে যেন তা সক্ষম হয় সেটাও দেখতে হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা যাঁরা পাবেন তাঁদেরকে পুরো প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে নিতে হবে। এতে যেমন তাঁদের চাহিদামাফিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, তেমনি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হলে তা মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও পাওয়া যাবে। এ সবের জন্য এমন এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিপোষণ দরকার যেখানে গরিব ও কমসুবিধাভোগী মানুষের অধিকার সংগতিপূর্ণভাবে সমুন্নত থাকবে ও তার জন্য লড়াইও চলবে। ২০২১ সালের দিকে আমরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জাতিতে পরিণত হতে চাইলে যা-যা করণীয় সে-সবের কিছু নীচে আলোচিত হল।

৪.১ প্রজননহারের প্রতিস্থাপন স্তর

গত ৩০ বছর ধরে এদেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকলেও এখনও জনসংখ্যা যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাত্রা ঊর্ধ্বগতি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের অবস্থা নিম্নমুখীই থেকে যাবে। সম্প্রতি জাতিসংঘের অভিক্ষেপণে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ, কি তারও পূর্বে, জন্মহারের মাত্রা আরও কমানো সম্ভব— যদি নারীশিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরুষদের সচেতনতা বাড়ানো যায়। পরবর্তী ১৫ বছরে সম্ভাব্য অন্যান্য উপাদান জন্মহার কমানোয় সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। যেমন ধরা যাক—শহরাঞ্চলের দ্রুত বৃদ্ধি, কৃষিকাঠামোয় রূপান্তর, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা এবং মেয়েদের চাকরিবাকরির সুযোগ সন্তানের গুরুত্ব ও তাদের প্রতি মনোযোগ বাড়াবে ও সন্তান প্রতিপালনের ব্যয়ভার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।

বাংলাদেশে প্রজননহারের প্রতিস্থাপন স্তর অর্জন ও জনসংখ্যাকে স্থিতাবস্থায় রাখার চেষ্টার বাইরেও এখনকার জনসংখ্যাহারের গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় আগামী বছরগুলোতে আমাদেরকে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখী থেকে যেতেই হবে। প্রজননহারের প্রতিস্থাপন স্তর অর্জন করার পরও ২০২১ সাল নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১৮ কোটিরও বেশি; সে হিসেবে বাংলাদেশ হয়ে পড়বে (ছোট ছোট কিছু নগররাষ্ট্র বাদ দিলে) পৃথিবীতে সর্বাধিক জনঅধ্যুষিত এক দেশ। সেই সমস্যার কার্যকর সুরাহার জন্য মায়েদের শিক্ষা ও শিশুদের স্বাস্থ্য খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। ইচ্ছাসাপেক্ষে নারীর সন্তান গ্রহণ এবং তাদের গর্ভধারণ করা বা না-করার অধিকার বাড়ানোর ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে।

৪.২ সকল শিশুর জীবন রক্ষা ও সুস্থ সবল বিকাশ

কোনো জাতির স্বাস্থ্য নির্ভর করে শিশু ও তার জননীর স্বাস্থ্যের ওপর। বাংলাদেশে প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যায় নবজাতক ও প্রসূতির মৃত্যু ঘটে তা এখন জ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে রোধ করা সম্ভব। আজকের মাঝারি আয়ের এশীয় দেশগুলোর (যেমন মালয়শিয়া) মতো সদ্যোজাত সন্তান ও প্রসূতির মৃত্যুহার কমানোর জন্য কার্যকর, সামর্থ্য-উপযোগী ও অনুকূল সেবাযত্ন দেওয়া ২০২১ সালের ভেতরে না করতে পারার কোনো অজুহাত আমাদের থাকবে না। সারা দেশ জুড়ে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা দানের বন্দোবস্ত করা গেলে প্রসূতির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং মেয়েদের প্রসব-পূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবাযত্ন প্রতি জেলাতেই দেওয়া সম্ভব হবে। মাতৃসদনে কিংবা প্রশিক্ষিত দাইয়ের হাতে বাড়িতে যেন প্রসব করানো হয় তা দেখতে হবে। এইসব দাই যাতে জরুরি অবস্থায় রক্ত পরিসঞ্চালনসহ অন্যান্য ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়ার জন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতিকে পাঠিয়ে দিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অসুস্থ সদ্যোজাত শিশুর সেবাযত্ন যাতে মহিলারা করতে পারে সেজন্য স্থানীয় স্তরে সামাজিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্ঘটনাজনিত শিশুমৃত্যুর (পানিতে ডুবে মরা একটা বড়ো কারণ) হার অত্যন্ত বেশি। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণও প্রায়শ ঘটে থাকে। অপুষ্টিতে ও নিম্নমানের জনস্বাস্থ্যসেবার কারণে ধীরে ধীরে ক্রমশ মৃত্যুর শিকার হয় শিশুরা। মা ও শিশুর শিক্ষা আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করা এবং দক্ষ ও জবাবদিহিপূর্ণ জনস্বাস্থ্য পদ্ধতি চালু করে এ-সব সমস্যা দূরীভূত করতে হবে। নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভেতর দিয়ে এ-সব ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে পুরুষদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

৪.৩ নারীর উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও সার্বিক কল্যাণ

শিক্ষালাভে মেয়েদের আনুপাতিকভাবে কম অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য ব্যাপারে অমনোযোগ তাদের প্রসবকালীন মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ। লিঙ্গবৈষম্য ও নারীর প্রতি নৃশংস আচরণ মেয়েদেরকে রোগ, পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর সহজ শিকারে পরিণত করে। সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর গর্ভধারণ করা বা না-করার অধিকার যদি

প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে নারীর আত্মমর্যাদা বাড়বে, সামাজিক অবস্থান উন্নত ও অগ্রগণ্য হবে। আগামী পাঁচ বছরে নারীশিক্ষা ও তাদের স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকল নারীকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয়সাশ্রয়ী বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। নারীর পুষ্টি ও প্রজননসম্পৃক্ত স্বাস্থ্যের অবস্থা অন-লাইন তথ্যযোগাযোগে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হলে মেয়েরা উপর্যুপরি ও ঘন ঘন সন্তানধারণের কবল থেকে বাঁচবে; বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে—প্রথমে শহর এলাকায় ও পরে সারা দেশ জুড়ে—উঠতিবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে এই জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে। একই ধারায় সহায়তা-কেন্দ্রগুলো (call centres), যা কিনা প্রজননস্বাস্থ্যে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা পরিচালিত হবে, সামাজিকভাবে চলে আসা বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংস্কার বিষয়ে নারী ও কিশোরীদের তাদের পরিচয় সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য রেখেই সংশ্লিষ্ট তথ্য ও পরামর্শ দেবে। দেশ জুড়ে সকল পরিবার যাতে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যাদি সহজে পেতে পারে তার জন্য বর্তমান 'টেলিসেন্টার' ব্যবস্থার মতো উদ্ভাবনধর্মী ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করে তুলতে হবে। তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা ছাড়াও, সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দানের লক্ষ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা-ছক প্রণয়ন করতে হবে। এটি তৈরি করতে হবে সরকারি ও বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ওপর ভিত্তি করে।

৪.৪ প্রাথমিক ও মানসম্মত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

আমরা বুঝতে পারি যে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সকলের সমতাবিধানের অর্থ হল সর্বপ্রথমেই সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা। সর্বপেক্ষা জরুরি মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা বলতে যা বোঝায় সেগুলো জনসাধারণের সকলের নিকট সহজপ্রাপ্য করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রগুলোর ভেতর দিয়ে সরকার এখন যে-সেবা প্রদান করছে তার ওপর এ হবে এক উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষসাধন। সরকারি ও এনজিও খাতের যৌথ অংশীদারিত্বমূলক কর্মপ্রবর্তনায় জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা নীতি প্রতিষ্ঠা ও চালু করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করে প্রাথমিক দায়িত্বভার রাষ্ট্রের ওপর বর্তালেও এ সকল স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর ব্যাপারটি (আংশিক আর্থিক দায়িত্ববহন সমেত) বেশির ভাগই ভাগাভাগি করে নিতে হবে বেসরকারি উদ্যোক্তা, এনজিও ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে; তার ফলে যথোপযুক্ত মূল্যে নানা স্তরের চিকিৎসার আয়োজন করার জন্য বহুস্তরসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি গড়ে উঠবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সঙ্গে এ জাতীয় সেবাকে যুক্ত করা যায় কি না। এ ধরনের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবার জবাবদিহি স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও মানুষজনের অধিপরামর্শ ও সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হবে। টেলিমেডিসিন ও ই-মেডিসিনের ব্যাপক ব্যবহার চালু করতে হবে, বিশেষভাবে জটিল অসুখবিসুখের ব্যাপারে তো বটেই; তাহলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসেও একজন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের কোনো ডাক্তার কিংবা সিঙ্গাপুর কি থাইল্যান্ডের কোনো বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামোয় গতি সঞ্চার করে এই সেবা গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৪.৫ মা ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টির আয়োজন

প্রসূতি ও শিশুর অধিক মৃত্যুহারের কারণ যে-অপুষ্টি তা আমাদের স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির ওপরেও বড়ো ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলেছে; কারণ অপুষ্টির ফলেই অকালপ্রসবের সংখ্যা বেড়ে যায় ও অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। বাংলাদেশে মানুষের অপুষ্টিজনিত সমস্যাদির অর্থনৈতিক ফলাফল বিশাল, কারণ এর জন্য উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিখনক্ষমতার সামর্থ্য কমেছে। নবজাত শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত পরীক্ষা করবেন, প্রয়োজনে মা-বাবাদের করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেবেন—এরকম একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সুপথ্য ও নারীশিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে শিশুদের অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা কমে গিয়ে পূর্ব-এশীয় দেশগুলোর

পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। জাতীয় স্তরে অবশ্যকরণীয় হিসেবে স্কুলে খাদসরবরাহ-কর্মসূচি চালু করলে বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি পূরণে সাহায্য হবে। এর জন্যে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে এবং স্থানীয় জনগণ তদারকি করবে বাস্তবায়নের। শিশুসন্তানকে স্তন্যদান (বুকের দুধ ও পরিপূরক অন্য দুধ খাওয়ানো) ও তার জন্য অন্য খাবার তৈরির গুরুত্ব বিষয়ে শিশুর মাকে প্রশিক্ষিত করা গেলে অপুষ্টির ব্যাপ্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪.৬ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ ও তার সুরক্ষা

এদেশের মানুষ যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অসুখে ভোগে তার কারণ সহজে ছড়ায় এমন রোগবালাই। পুষ্টিহীনতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব নানান সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের জন্য দায়ী—নিউমোনিয়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, হাম ইত্যাদি; তা ছাড়া ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, হেল্‌মিন্‌থিয়াসিস্ জাতীয় জীবাণুঘটিত অসুখবিসুখে লোকে ব্যাপকভাবে পীড়িত হয় ও মারা যায়। সংক্রামক ব্যাধির সবচেয়ে বেশি শিকার হয় বাচ্চারা। এইসব শিশু বেশির ভাগ আসে হতদরিদ্র অবস্থার ভেতর থেকে—যে-সব জায়গায় তারা অপুষ্টিতে ভোগে এবং জানেও না কী কী করলে জীবন বাঁচানো যায়, ওষুধপত্র কোথায় মিলবে কিংবা সেগুলো কেনার সংগতিও থাকে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবাসহ কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দেওয়া গেলে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার ওপর যেমন জোর দিতে হবে, তেমনই সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে।

তা ছাড়া গরিবগুর্বোদের রোগভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবানদেরও অসুখবিসুখের ঘটনা ক্রমে বেড়ে চলেছে। উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপনে বহু লোকের ডায়বেটিস ও হৃদরোগের মতো খাদ্যপ্রসূত অসংক্রামক ব্যাধি হচ্ছে। সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম উভয়কেই ভোক্তাসাধারণ, বিশেষত যুবসমাজ ও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ভেতরে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারদাবার ও জীবনযাপন বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। বর্ধিত জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের ওপর যে বিপুল চাপ সৃষ্টি করছে তার ফলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে; আর সে-কারণে ক্যান্সার, আন্ত্রিক ব্যাধি ও হাঁপানি জাতীয় নানা নতুন নতুন অসুখ দেখা দিচ্ছে। খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে যথা সত্ত্বর ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারি আইনকানুন আরও কড়া করতে হবে; তখন দেখা যাবে স্বাস্থ্যহানিকর নিম্নমানের আহার্যের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ে প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে। সামনের দিনগুলোয় রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য মানুষের ক্রয়সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, তখন মানুষজনের খাদ্য নির্বাচনের পরিসর ও সুযোগ বাড়বে। কিন্তু সে-সবের জন্য কমখরচে কৃষিব্যবস্থায় বেশি উৎপাদন কীভাবে করা যায় এবং প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য বাজারে আনা যায় (দ্রষ্টব্য অভীষ্ট ৩-এর ৩.১) তা দেখতে হবে।

এদেশের মানুষ যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অসুখে ভোগে তার কারণ সহজে ছড়ায় এমন রোগবালাই। পুষ্টিহীনতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব নানান সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের জন্য দায়ী—নিউমোনিয়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, হাম ইত্যাদি; তা ছাড়া ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, হেল্‌মিন্‌থিয়াসিস্ জাতীয় জীবাণুঘটিত অসুখবিসুখে লোকে ব্যাপকভাবে পীড়িত হয় ও মারা যায়।

৪.৭ জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে নির্মল পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থা প্রতিটি নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা

আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ২০২১ সাল নাগাদ নির্মল পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন

ব্যবস্থা দেশবাসীর কাছে বিলাসিতা বলে আর গণ্য হবে না। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে এমন কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে যা কার্যকর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে; তার অর্থ—পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থা সচল রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ-অনুকূল হাসপাতাল তৈরি, কলকারখানার বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এইসব প্রচেষ্টার পেছনে সমবেত করতে হবে প্রকৌশলী, পুষ্টিবিজ্ঞানী, পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ—দেশ জুড়ে সকলকে, এবং সঙ্গে থাকবে স্থানীয় সরকারের নানা সংস্থা ও এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। যেমন, পানি সরবরাহ, সরবরাহ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও পানীয় জলের মান ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৌশলিক দক্ষতার মানুষজনের সহায়তা স্থানীয় অধিবাসীরা যাতে পেতে পারে সে-ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য দরকার হবে। এলাকার অধিবাসী ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কাঠামোতে জাতীয়-নীতি গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে সে-সব নীতি বাস্তবায়নে প্রায়োগিক ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল গ্রহণ করে নির্মল পানীয় জল সরবরাহ, পানীয় জলের মান সংরক্ষণ, মলমূত্র নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে ছেলে-বুড়ো সকলের প্রশিক্ষণ আয়োজন জাতীয় কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা যায়। সাধারণভাবে হাসপাতাল সেবার চেয়ে জনস্বাস্থ্যসেবার উন্নতি স্বাস্থ্যসূচকসমূহ, যেমন শিশুমৃত্যু ও সংক্রামক ব্যাধির ওপর বড়ো প্রভাব ফেলবে। জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারলে আর্থিক কারণে ডাক্তার দেখাতে অক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে এবং সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সমতাবিধান করা সম্ভব হবে।

৪.৮ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ও এলাকার মানুষজনের অংশগ্রহণ

সমতাভিত্তিক, দক্ষ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে; তা ছাড়া স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচি ও সংস্কার ইত্যাদির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ধরনের কোনো পদ্ধতি নিলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই তার ভেতরে টেনে আনতে হয়, নইলে তাদের এবং তাদের শিশুদেরও নানারকম স্বাস্থ্যসমস্যা বোঝা সম্ভব নয়। অধিক কার্যকর স্বাস্থ্যশিক্ষা দান, পরিবেশজাত বিভিন্ন ব্যাধির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে জনগোষ্ঠীকে সুসংহত করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শিশুসহ সকলেই আধিব্যাধির যে রকম শিকার সে-অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা স্থানীয় অধিবাসীকেই নিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার কাজ ঠিকমতো চলবার জন্য স্থানীয় সরকারের নানা সংগঠনের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দের চাপ সৃষ্টি কীভাবে করা যায় সে ব্যাপারে স্থানীয় সমাজকে বহু কর্মপদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে; স্বাস্থ্যসেবাকে কার্যকর করে তুলতে এঁরাই তো প্রধান ভূমিকা রাখবেন, কারণ এঁরাই উপকৃত হবেন। এমনটা করতে হলে যাবতীয় অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবীদের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ওষুধপত্র তৈরি ও বিতরণ এবং ডাক্তারি যন্ত্রপাতির উৎপাদন ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে সুসমন্বিত করতে হবে, এর উল্টোটা এখন যেমন চালু রয়েছে তা বহাল রাখলে চলবে না। একমাত্র এভাবেই একটা ব্যয়সাশ্রয়ী, জনদরদী, জবাবদিহিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা সকলের নিকট পৌঁছানো সম্ভব; পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতাসহ সরকারের স্থানীয় নানা সংগঠন এতে অর্থ জোগান দেবে ও পরিচালনা করবে। স্বাস্থ্যখাতে স্থানীয় লোকদের জাতীয় সম্পৃক্ততাকে সমর্থন করতে গেলে স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তনের অর্থ হল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বাস্থ্যখাতে আয়-ব্যয়ের যথোপযুক্ত বাজেট তৈরি। আর, সবই ঘটিয়ে তুলতে হবে সম্ভব্য ন্যূনতম সময়পরিধিতে এবং দ্রুতবেগে।

৪.৯ সুকঠোর ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থা

যদি আমরা আমাদের জনগণকে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাই, তাহলে জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি ডাক্তারি শিক্ষা, নার্সিং ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয়

প্রাথমিক বিভিন্ন বিষয় ও প্রাক্‌চিকিৎসা শিক্ষার (আরও দ্রষ্টব্য অভীষ্ট ৫) ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের মান উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন পড়বে। ভালো চিকিৎসক হওয়ার জন্য যে-প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তার পাঠ্যসূচিকে সুকঠোর ও মূল্যবোধপ্রসূ হতে হবে। মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা কেবল প্রাথমিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নিদানিক ঔষধ বিষয়ে প্রশিক্ষিত হবেন না, তাঁদের ডাক্তারি নীতিজ্ঞান, আইনিভাবে বৈধ ওষুধপত্র, রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, যোগাযোগ-সংক্রান্ত দক্ষতা ও গবেষণা পদ্ধতি সমেত যত কিছু ডাক্তারি পেশায় দরকার লাগে সবই শিখতে হবে। ওষুধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা এবং আরোগ্যদানের কৌশল হিসেবে রোগীর সঙ্গে আচরণ—এই উভয় ব্যাপারে চমৎকার ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করে চলা যায় সে-বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রশিক্ষিত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। 'অব্যাহত চিকিৎসা শিক্ষা'র অংশ হিসেবে পরীক্ষায় ডাক্তারি পাশ করার পরেও দশ থেকে বারো বছর পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষাগ্রহণ চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উন্নতির সঙ্গে নিজকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য সমস্ত পেশাজীবন জুড়ে ডাক্তারদের নানান ধরনের সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মসূচিতে অংশ নিরবচ্ছিন্নভাবে নিতে হবে। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষার পাশাপাশি মেডিকেল কলেজগুলো যাতে গবেষণা ও প্রান্তবর্তী স্বাস্থ্যসেবাকে মনোযোগের সঙ্গে দেখে সে ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যমান সুযোগসুবিধার যোগ্যতর ব্যবহার এবং নবতর উদ্যোগ-আয়োজনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; এর উদ্দেশ্য হল—নার্স, প্যারামেডিক, চিকিৎসা-টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং শিশুর জন্মকালীন পরিচর্যাকারী ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা। গ্রামে গিয়ে থাকা ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযোগ্য প্রণোদনা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। যথাযথভাবে রূপরেখা তৈরি করে রেফারেল সিস্টেম চালু করতে হবে।

অভীষ্ট ৫

সুদক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলা

২০২১ সাল নাগাদ প্রশাসন-ব্যবস্থার এক দক্ষ পদ্ধতি ও অধিকতর গতিশীল অর্থনীতি নির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক রূপ নির্ধারণ করে তাতে অর্থ জোগান দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়াবে। ২০২১ সাল নাগাদ তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক যে-জনসংখ্যা এদেশে হবে তাতে বাংলাদেশে স্বল্পদক্ষ, দক্ষ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর এক বিশাল ভাণ্ডার আমরা হাতে পাব; তারা যেমন দ্রুত বর্ধনশীল দেশীয় বাজারের চাহিদা মেটাতে পারবে তেমনই দেশের বাইরে ও ভেতরে নানা প্রান্তে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজারের চাহিদা অনুযায়ীও কাজ করতে পারবে।

বাংলাদশে এমন একটি সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার যা আমাদের মেধা ও জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভূত ভূমিকা রাখবে—আমাদের অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করবে, বিদ্যালয় স্তরে আরও বেশি উন্নতিসাধন করবে, আমাদের সমাজ ও মূল্যবোধ তৈরির ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে, শিল্পক্ষেত্রে নতুন নতুন পণ্যের আবির্ভাব ঘটাবে, উপযুক্ত পরিচালনজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ব্যবসাকে আরও লাভজনক জায়গায় নিয়ে যাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করে তাকে কম ভারগ্রস্ত ও আরও কার্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে এবং সর্বোপরি পুরনো অকেজো সব নিয়ম ও পদ্ধতি সরিয়ে দিয়ে নতুন, অর্থপূর্ণ ও ফলদায়ী কর্মপন্থা প্রবর্তন করতে অনুপ্রানিত করবে। শহর ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে সেই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যেতে হবে। কাজেকাজেই, এক শিক্ষিত জনসংখ্যা ও দক্ষ শ্রমশক্তি ২০২১ সাল নাগাদ পাওয়ার লক্ষ্য আমাদের অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন প্রয়োজন।

৫.১ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা

২০২১ সাল নাগাদ দেশের সব ছেলেমেয়েকে মানসম্মত প্রাথমিক (আট বছর) ও মাধ্যমিক (চার বছর) শিক্ষা (সব মিলিয়ে বারো বছর) দেওয়া সম্ভব। যারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিতে চাইবে তারা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে সেদিকে যেতে পারবে (বিশদভাবে ৫.৫-এ আরও লিপিবদ্ধ আছে)। পারিবারিক আয়, লিঙ্গভেদ, ধর্ম, জাতিসত্তাগত পরিচয় বা প্রতিবন্ধিত্ব নির্বিশেষে কোনো শিশুই শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। সেই লক্ষ্য পূরণে মাধ্যমিক বৃত্তিদান কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে আরও প্রসারিত হবে যাতে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই তার পরিধিতে আসতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষক প্রতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শ্রীলঙ্কায় যা রয়েছে তার প্রায় তিনগুণ বেশি। শিক্ষার প্রসারণ ও মান যাতে ২০২১ সাল নাগাদ অতিদ্রুত উন্নত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। সে-লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি হল যোগ্য ও আত্মনিবেদিত শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়মিত উপস্থিতি, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণের সুযোগসুবিধাদি নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতে বাধ্য করা। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যাপারে এমন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার 'প্রত্যাশিত শিক্ষামান পরিকল্পনা' প্রণয়ন করতে সক্ষম হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির স্বায়ত্তশাসন ও জবাবদিহি বহাল রেখেই প্রয়োজনীয় অর্থ-উপকরণ ইত্যাদির সংস্থান তাকে দেওয়া হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অব্যাহত পেশাদারি মানোন্নয়নে

যথাবিহিত প্রণোদনা যাতে পেতে পারেন সে-উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্য আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে।

৫.২ সুসংহত/একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা

বহু অংশে বিভাজিত শিক্ষাব্যবস্থা (যেমন বাংলা মাধ্যমে, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা, মাদ্রাসা পদ্ধতি) জনসংখ্যায় নানান বিভক্ত সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, ফলে সমাজে বিভিন্ন অংশের ভেতরে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না কিংবা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগাযোগই থাকে না। শিক্ষার দিক থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্তী মানুষজনের একটি বিখণ্ডিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান মেনে নেওয়া, আবার সেইসঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা—এর জন্য আমাদের চিন্তাভাবনা করা দরকার কী করে একটি সুসংহত/একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সকল শিক্ষার্থী কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে, যদিও অতিরিক্ত/পরিপূরক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাদের থাকবে।

এরকম একটি ব্যবস্থা ২০২১ সালের অনেক আগেই ন্যূনতম সময়ের ভেতরে আমাদের চালু করে দিতে হবে। শিক্ষার্থী সকলের জন্য একটি সাধারণ মৌলিক পাঠক্রম ও অর্জিতব্য কিছু লক্ষ্য (অবশ্যপাঠ্য বিষয়াদি, যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত পঠনপাঠন প্রভৃতি) নির্দিষ্ট থাকবে, এবং ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয়ও থাকবে যেগুলোতে অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি ও লক্ষ্য নিরূপণ করে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা ও ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলসহ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে এবং নানা প্রকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে; তবে প্রত্যেককেই মৌলিক পাঠক্রমের চাহিদা পূরণ অতি অবশ্যই করতে হবে। এরই ক্রমানুসরণে তারা পরে মাধ্যমিক স্তরে তাদের পছন্দসই কোনো শিক্ষা গ্রহণ করার বৃহত্তর ক্ষেত্র হাতে পাবে। কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পড়াশোনা ঘটবে অন্তিম পর্যায়ে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে উচ্চমাত্রায় দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে যে-দ্বিভাষিতার লক্ষ্য নির্ণীত আছে তার জন্য থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা; মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক যাতে আসেন ও থেকে যান তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের যেন বই পড়া, অঙ্ক কষা ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়—বিশেষ করে যখন দু-শিফ্‌টে চালু দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অনেকটা সীমিত সময়ের জন্যই ছাত্রেরা শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়।

শিক্ষার দিক থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্তী মানুষজনের একটি বিখণ্ডিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান মেনে নেওয়া, আবার সেইসঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা—এর জন্য আমাদের চিন্তাভাবনা করা দরকার কী করে একটি সুসংহত/একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সকল শিক্ষার্থী কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে, যদিও অতিরিক্ত/পরিপূরক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাদের থাকবে।

৫.৩ সকল স্তরে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ

সুসংহত/একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কিছু ন্যূনতম সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত রাখতে হবে যাতে সমস্ত স্কুল—তা সে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে যেভাবেই চালু হোক না কেন—তাদের শিক্ষার্থীদেরকে একই মানের শিক্ষা দিতে পারে। যেমন, মৌলিক পাঠক্রম উত্তমরূপে শেখাতে গেলে সমস্ত বিদ্যায়তনে একই ধরনের মানবসম্পদ জোগান দিতে হবে। একই উপায়ে, বিজ্ঞানসম্পর্কিত বিষয়গুলোয় সকল শিক্ষার্থীকে সমভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হলে সব স্কুলে শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার, গ্রন্থাগার সমেত তুলনামূলকভাবে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে।

শিক্ষালাভের অন্তিম পর্যায়ে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যত মহাবিদ্যালয় রয়েছে (যেখানে অন্তিম পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ ভাগ ভর্তি হয়) সেখানে শিক্ষামান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ও যেগুলো নতুন স্থাপিত হবে সেখানেও, নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিয়মিতভাবে শিক্ষামানের মাত্রা নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষার মান যাচাই ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেসরকারি ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য স্বীকৃতিদানের পন্থা চালু করতে হবে। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও অনুমোদন লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্ধারিত অবশ্যপ্রয়োজনীয় মানের চাহিদাপূরণ বাধ্যতামূলক হবে।

৫.৪ যুবসমাজে মূল্যবোধ পরিচালিত বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা

আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনশীল চরিত্র অনুযায়ী সব কিছু যেভাবে ক্রমশ বিশেষজ্ঞমুখী, চাপসৃষ্টিকারী ও হাই-টেকসর্বস্ব হয়ে উঠছে তাতে অত্যুত্তম বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় সক্ষম এমন শ্রমশক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের ভেতরে এ সমস্ত গুণ শাণিত করার লক্ষ্যে শিক্ষণ-প্রণালীর ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এখনও বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রণালীতে মুখস্থবিদ্যাই ঘুরপাক খাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর ও গাইডবুকের ওপর প্রচণ্ডরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ২০২১ সাল নাগাদ পাঠ্যসূচি, বিশেষত পরীক্ষাপদ্ধতি, এ জাতীয় মুখস্থবিদ্যানির্ভর যেন না থাকে সে-ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই কোনো ছাত্র আর গাইডবুকের দ্বারস্থ হবে না কিংবা প্রাইভেট টিউটর রাখবে না। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষামান যাচাই, হাতেকলমে পেশাদারি দক্ষতা তৈরি ও পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নজাত সংস্কৃতিতে যাতে ভালোকে (অর্থাৎ নতুন সুযোগ ইত্যাদি) আঁকড়ে ধরে ও মন্দকে (অর্থাৎ মাদক দ্রব্যাদি, বিপজ্জনক দৈহিক সংসর্গ ইত্যাদি) দূরে রেখে সততা, আন্তরিকতা ও ঔদার্যনির্ভর জীবনের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের ভেতরে জন্মায় সেরকম মূল্যবোধ তাদের অন্তরে এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রোথিত করে দেবে। তদুপরি, শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে আমাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিসত্তাগত বৈচিত্র্য ভালবাসতে এবং আমাদের জাতীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করতে যাতে আমাদের সন্তানসন্ততি সক্ষম হয় সে-শিক্ষা দেওয়া।

৫.৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান

২০২১ সাল নাগাদ আমাদের দেশে তরুণবয়সীদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হবে। কোনো-না-কোনো কাজে তাদেরকে দক্ষ করে তুলে কর্মসংস্থানের যোগ্য করা (ছোটখাটো ব্যবসাসহ) আমাদের নির্ধারিত অগ্রাধিকারগুলোর ভেতরে অন্যতম হবে। মানবসম্পদ বিকাশের নীতির অংশ হিসেবে সুস্পষ্ট জীবিকা গ্রহণ স্কুল পাশ করা নানা ধরনের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের পক্ষে যাতে সম্ভব হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেমন ধরা যাক, বিভিন্ন নতুন নতুন ব্যবসা—যেগুলোর দারুণ চাহিদা বিশ্ব জুড়ে কোম্পানিগুলোতে রয়েছে (যেমন একাউন্টিং ও ফিন্যান্স সার্ভিস, গ্রাফিক ডিজাইন, কল সেন্টার, অ্যানিমেশন ও এ জাতীয় বহু কিছু) সে-সবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছেলেমেয়েদের জন্য চালু করতে হবে। অন্য ধরনের ট্রেনিং ইন্সটিটিউট শিক্ষার্থীদেরকে বাণিজ্যিক ও চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কি প্রকৌশলের কোনো পদের জন্য যোগ্যভাবে তৈরি করতে পারে। উচ্চতর প্রকৌশল কেন্দ্রসমূহ উঠতি শিল্পকারখানা, বিশেষত হাই-টেকের ক্ষেত্রে, যে-সব দক্ষ শ্রমিকের খোঁজ করে তেমন দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সার্টিফিকেশন সিস্টেম এ

ব্যাপারে খুব কাজ দেবে; তার ফলে পাশ করা শিক্ষার্থী যে-স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে ইচ্ছুক সে-ক্ষেত্রে পছন্দমাফিক শিক্ষা (যেমন স্বল্পদক্ষ বনাম দক্ষ; উচ্চমানের দক্ষতা/তত্ত্বাবধান স্তর বনাম উচ্চমানের দক্ষতা/ব্যবস্থাপনা স্তর) নিতে পারবে। এ-সব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পেশা গ্রহণ বা ইচ্ছানুযায়ী চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করতে পারবে। এ ধরনের লক্ষ্য পূরণ একমাত্র সম্ভব হতে পারে যখন বিদ্যায়তনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচুর ক্ষমতা থাকবে। নানারকম নির্দিষ্ট শিক্ষায়তন বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা পরিমাপ করবে, পরিকল্পনা-পাঠক্রম প্রণয়নে সম্ভাবনাময় নিয়োগকর্তাদের সংশ্লিষ্ট করবে, সেবা দানের বিনিময়ে ও কারখানাজাত উৎপাদনসামগ্রী বিক্রি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগতির বন্দোবস্ত করবে। প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবে তাদের শিক্ষার্থীদেরকে হাতেকলমে অভিজ্ঞ করে তুলবে এবং চাকরির বাজারে তাদের টিকে থাকা নিশ্চিত করবে।

৫.৬ সর্বোত্তম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক উচ্চপর্যায়ের অবৈতনিক শিক্ষাদান

আমাদের লক্ষ্য হল ২০২১ সাল নাগাদ দেশে মেধাসম্পদে গুণান্বিত ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থা তৈরি করা। সেই অভীষ্ট অর্জনে আর্থিক সংগতি, জাতিসত্তাগত পরিচয় বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে প্রত্যেক মেধাবী শিশুকে শিক্ষার অন্তিম স্তর অবধি উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা দানের (ঋণপ্রকল্প ও অনুদানের মাধ্যমে) প্রক্রিয়া চালু করতে হবে—যেন মেধাবীদের সমভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা যায় এবং অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী কোনোভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রয়োজনভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি-কর্মসূচির মাধ্যমে মেধাকে পুরস্কৃত করার জন্য ব্যাপকভাবে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশের সকল বিদ্যার্থীর জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ও ছাত্রবৃত্তি দানের অঙ্গীকার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ই করবে। এই লক্ষ্য সিদ্ধিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিতে হবে। অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সেরা ছাত্রছাত্রীদেরকে অন্তিম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন; কারণ এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রই দেশে আগামী দিনের পণ্ডিত ও নেতৃবর্গের সূতিকাগার হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

৫.৭ গবেষণাকর্মের সুযোগ বৃদ্ধি

গবেষণা ও শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় মূলত স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের উপযোগী বিদ্যায়তন। ২০২১ সাল নাগাদ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন স্নাতক-শিক্ষাকর্মসূচি রাখতে হবে যার ফলে গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া সম্ভব হয়। এ-সব গবেষণা পরিচালিত হবে এমন সব ক্ষেত্রে যা সরাসরি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে স্নাতক পর্যায়ের ওপরে কোনো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় নিয়োজিত থাকার কোনো সুযোগ প্রতিভাবান কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। এরকম বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান থেকে সরে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারকেন্দ্রিক বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। ২০২১ সাল নাগাদ দেশে যথেষ্ট গবেষণা-প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে উঠবে যেখানে তীক্ষ্ণধী ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যৎ চাকরি ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছাড়াই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করতে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পর্ষৎ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে; পর্ষদে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধীনের মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ডের নানা শাখা থেকে খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গকে একত্র করা হবে। সহস্রাব্দ বিজ্ঞান উদ্যোগের (Millemium Science Initiative) সহায়তায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে; ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সৃষ্টিশীল গবেষণাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষিত করা হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও

গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত করা হবে।

৫.৮ বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যকর শিক্ষাপ্রশাসন

আমরা যদি ২০২১ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে এমন এক শিক্ষাপরিবেশ আমাদের তৈরি করতে হবে যেখানে কোনো দলীয় রাজনীতির জিম্মি না হয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারবেন। এর অর্থ এই নয় যে, ছাত্র বা শিক্ষক কেউ গুরুত্বপূর্ণ কোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যায় তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন না কিংবা নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। অগত্যা, রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা যেভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জবরদখল করছে তা তারা বন্ধ করতে বাধ্য হবে এবং এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় রাজনীতি বন্ধ করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নিয়োগ, শিক্ষক নির্বাচন ও পেশায় উন্নতি সব কিছু ঘটবে একমাত্র মেধার ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক পরিচয়কে বিবেচনায় না এনে।

স্থানীয় সমাজে শিক্ষকদের জবাবদিহি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত জরুরি। সে-লক্ষ্য সিদ্ধ করতে হলে বিভিন্ন স্থানীয় শিক্ষা বোর্ড (যেমন ভারত ও অন্যান্য বহু দেশে রয়েছে) স্থাপন করতে হবে; শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, পাঠদানে শিক্ষকের দায়িত্বপালনের তদারকি ও খোঁজখবর করা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সমাজের সম্পৃক্ততার ওপর দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে বোর্ডগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও কর্তৃত্ব থাকবে। রাজনীতিবিদদের মতো স্থানীয় সাংসদবৃন্দও বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা-পর্ষদে সদস্য হতে পারবেন না। বরং স্থানীয় মানুষজন ও সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা-পর্ষৎ গঠিত হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি ও চাকুরিকাল নির্ধারিত হবে সহকর্মীবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। একটি নীতি গ্রহণ করতে হবে, তা হল : সব রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেগুলো সরকার থেকে অর্থসাহায্য ও কর্মীবৃন্দের বেতনের টাকা পায় তাদেরকে শিক্ষাদানে দায়িত্বপালন-চুক্তি সই করতে হবে, এবং যতদিন তারা চুক্তিমাফিক দায়িত্ব পালন করে যাবে ততদিন তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে স্বচ্ছ রাখবে ও জবাবদিহি করবে। কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে চলা নয়, বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত অগ্রগতিই সরকারি অর্থায়ন ও সহায়তা লাভের ভিত্তি হবে। নির্ধারিত মান ও ফলাফলে সফলতার মাত্রা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যতটুকু রক্ষিত হবে তদনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সে-প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত বিকশিত করা ও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে দিক্‌নির্দেশনা দেওয়া এবং সব সরকারের আমলেই একটি করে শিক্ষা কমিশন বসানোর রীতি ও তার সুপারিশ অগ্রাহ্য করার ঐতিহ্যকে এড়ানোর লক্ষ্যে একটি স্থায়ী 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুশীল সমাজ, বিদ্বৎমণ্ডলী, সরকারের শিক্ষা বিষয়ক নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিবৃন্দ সেই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং জাতীয় সংসদের নিকট কমিশনের সরাসরি জবাবদিহি থাকবে। জাতীয় শিক্ষা আইনে স্থিরীকৃত কর্মবিধি ও মর্যাদা মান্য করে কমিশনটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংগঠন (statutory body) হিসেবে গণ্য

আমরা যদি ২০২১ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে এমন এক শিক্ষাপরিবেশ আমাদের তৈরি করতে হবে যেখানে কোনো দলীয় রাজনীতির জিম্মি না হয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারবেন।

হবে। তার একটি বাজেট থাকবে এবং শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে নীতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার যোগ্য ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সচিবালয় থাকবে। এক বছর অন্তর এই কমিশন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ও নির্দিষ্ট প্রসঙ্গাদি বা শিক্ষাব্যবস্থার কোনো উপবিভাগ নিয়ে সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

৫.৯ সর্বজনীন কম্পিউটার শিক্ষা

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষাসেবা আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে অগ্রসরমাণ ডিজিটাল ও অন্যান্য যোগাযোগ-প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা দান করতে হবে। শিক্ষালাভের অন্তিম পর্যায়ে ও ক্রমশ অন্যান্য ধরনের বিদ্যায়তনে ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত কম খরচে সম্পন্ন হওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি সেবা দানকারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণের সুযোগসুবিধা থাকে। উচ্চতর শিক্ষা, পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ও ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশসাধনে প্রভূত সুযোগ দানের লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কর্মসূচি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও কলেজগুলোর সম্প্রসারণ-কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ-ভিত্তিক শিক্ষা ও দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। যাঁরা সুযোগবঞ্চিত, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, তাঁদেরকে কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

৫.১০ শিক্ষার সকল স্তরে নারী ও পুরুষের ভারসাম্য রক্ষা

২০২১ সাল নাগাদ সর্বস্তরে মেয়েরাও যেন ছেলেদের মতো একইভাবে শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীর শিক্ষালাভের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবেই দেখতে হবে। বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আরও এ কারণে যে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা অনুকূল প্রভাব ফেলে। উপরন্তু, বিশ্ববাজারে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান নারীকেন্দ্রিক হবে। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা, হাসপাতাল (নার্সের চাকরি), বৃদ্ধাশ্রম (সেবিকার চাকরি), শিশুপালন কেন্দ্র, গার্মেন্টস কারখানা, ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির এসেম্বল কারখানা প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠানে সেবাযত্নের দরকার সেখানে মেয়েরা সুবিধাজনক ভালো চাকরির সুযোগ পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের প্রতি অধিক মনোযোগপ্রবণ পাঠক্রম প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। মাঝারি আয়ের দেশের (অভীষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) সমপর্যায়ে কখনোই ওঠা যাবে না যদি-না শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ সমানভাবে করা যায়। এ-কথা মনে রেখে ছাত্রীদেরকে অন্তিম পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার লক্ষ্যে তাদেরকে যথার্থ পরিবেশ (কার্যকর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তা বিধান, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি) এবং সুযোগসুবিধা (বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার নিরাপদ যানবাহন, পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি) দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৫.১১ শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের সংস্কৃতি নির্মাণ

দক্ষ ও সৃজনশীল শ্রমশক্তি হল প্রাণস্পন্দনময় কর্পোরেট খাতের মেরুদণ্ড। এর বিনিময়ে আমরা যা আশা করতে পারি তা হল—বাংলাদেশ জুড়ে উচ্চতম মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করার মাধ্যমে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী তাঁদের স্থানীয় সমাজের ঋণ শোধ করবেন। বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেশন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই এ জাতীয় ব্যবস্থা দু-পক্ষেই সমান-সমান অবস্থা তৈরি করবে। এমন উদ্যোগে এমনকি ছোট ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও অংশ নিতে পারবে। এজাতীয় সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো যে সুনাম অর্জন করবে তা তাদের সরাসরি আর্থিক অবদানের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষায় সহযোগিতা দানে বেসরকারি কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যে ব্যয় করবেন তার জন্য যথাবিহিত কর রেয়াতের কথাও ভাবা যেতে পারে।

৫.১২ জনশিক্ষায় অর্থায়ন

বাংলাদেশের জন্য জাতীয় উন্নয়নের অন্য কোনো খাত শিক্ষার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দাবি করতে পারে না। সরকারি খাতে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয়ের অংশ বর্তমানে মোটামুটি দু শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে (যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়েও গড় হিসেবে কমই হয়) উন্নীত করতে হবে। এখন সরকারি বাজেটে শিক্ষায় যে-ব্যয় হয় পরবর্তী দশকে তা ১৫ শতাংশ বেড়ে দ্বিগুণ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যাপ্ত সম্পদ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-উন্নয়নে ও স্থায়ী আবর্তক ব্যয় উভয়ই মধ্যমেয়াদি (৩ থেকে ৫ বছর) বাজেট কাঠামোতে বাড়াতে হবে।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সমতাবিধান, শিক্ষার সমমান প্রয়োগ ও জ্ঞান আয়ত্তকরণের জন্য যে-ব্যয় (ছাত্রবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষাদান ইত্যাদি) হচ্ছে তার কার্যকারিতা ও ব্যয়-সাশ্রয় সেখানে কতখানি প্রভাব ফেলছে সে-সবও কঠোরভাবে হিসেবনিকেশ করে দেখতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় গুণগত মানবৃদ্ধির (যেমন গুণী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষা-সহায়িকা এবং ভৌত সুযোগসুবিধা) লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ রাখতে হবে। সর্বাধিক অর্থবরাদ্দ ও সম্পদ ব্যবহারের নিয়মনীতি নির্ধরণ করতে হবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন উপ-খাতে ও নির্দিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হবে। বিদ্যায়তনে সরকারি অর্থব্যয় ও প্রণোদনাদান যেন স্বীকৃত শিক্ষামান অর্জন ও চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তা দেখতে হবে।

অভীষ্ট ৬

বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে সুসম্পৃক্ত একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া

বাংলাদেশের প্রকৃতিদত্ত কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান তাকে ২০২১ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের এক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে। আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বাজার হবে। এই দুটি দেশে পণ্য ও সেবা রপ্তানির কাজে বাংলাদেশে মালামাল তৈরির কারখানা স্থাপন ও আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুযোগ থাকায় বিশ্বের বড়ো বড়ো কোম্পানিকে আমরা আকর্ষণ করতে পারি। নৌবাণিজ্যের পরিকল্পনা তৈরির সময়ে কোম্পানিগুলো কম খরচে শ্রমিক পাওয়ার ও পণ্য উৎপাদনে কম খরচে দেশে ভবিষ্যতে মাল-বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য জায়গা পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় এনে থাকে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এমন দুটি চারিত্র্যগুণ অর্জন করবে যার ফলে নৌবাণিজ্য-পরিকল্পনা রয়েছে এমন বহু দেশ সে আকর্ষণ করবে; কারণ, এখানে অপেক্ষাকৃত কম খরচে শ্রমিক পাওয়ার বড়ো একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে আর দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও ১৭/১৮ কোটি মানুষের চাহিদার কারণে যথেষ্ট বড়ো, উপরন্তু এর আশপাশ এলাকার ২০০ কোটিরও বেশি লোকের বাজার তার হাতের নাগালের ভেতরে থাকবে। ভারত ও চীনে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার কারণে বাংলাদেশের সামনে ব্যাবসার নতুন নতুন ক্ষেত্রও তখন উন্মোচিত হবে। যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রকৃত বহুমুখী মাধ্যম দ্বারা এসব দেশ পরস্পরসংযুক্ত হবে বলে বেশি দামের অনেক বিশেষ বিশেষ পণ্যসম্ভার ও সেবা সেখানকার বাজারে রপ্তানি করার সুযোগ আমরা পাব।

বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ হল—খুঁতখুঁতে মনোভাবাপন্ন ও নামিদামি বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের চোখে পয়লা নম্বর দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া। আর সে-আসন দখল করতে চাইলে আমাদেরকে যথপোযুক্ত নীতিমালা, অবকাঠামো, অর্থনৈতিক ও পুঁজি বাজার এবং মানবসম্পদের বিষয় সম্যকরূপে বুঝতে ও তৈরির কাজে হাত দিতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের আইনকানুন, প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পর্যটন ও পরিবহণের সুযোগসুবিধা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে মানুষজনের সব রকম যাতায়াত, বিনিয়োগ, মালামাল ও সেবা দেওয়া-নেওয়ার পক্ষে অনুকূল হয়।

৬.১ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিপণন কৌশল উদ্ভাবন

অত্যন্ত সচল ও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ বিভিন্ন শিল্পসমিতি (industry associations) থাকার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, নেতিবাচক ধ্যানধারণাকে সামাল দেওয়া, সরকারি স্তরে (সরকারি কোষাগার ও সম্ভাবনাময় মুনাফাক্ষেত্র উভয় দিকেই ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য সঠিক প্রণোদনাসূচক ব্যবস্থাগ্রহণসহ) ও শিল্পকারখানা স্তরে (মান নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত পুনর্বিন্যাস, অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যবস্থাপনা) কাজকর্মে অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ এবং আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা ও নিয়ন্ত্রণসূচক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে দেনদরবার ইত্যাদির কৌশল তারাই নির্ধারণ করবে। যৌথ সেবাদান (যেমন তথ্যপ্রযুক্তিতে, অর্থায়নে, মানবসম্পদের ক্ষেত্রে), ডাটা এন্ট্রি/ডাক্তারি

ট্রান্সক্রিপশন, এনিমেশন ইত্যাদি অজস্র নতুন নতুন ব্যাবসার ক্ষেত্র আমাদের শনাক্ত করতে হবে। একবার যদি আমরা ঠিকমতো দক্ষ শ্রমিকশক্তি বিকশিত করতে পারি এবং দুর্নীতি ও ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত বিনিয়োগ-পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ নিজের ক্ষমতাবলেই এইসব ব্যাবসা ধরতে পারবে।

৬.২ চট্টগ্রামের সমুদ্রতট ধরে মহাসমুদ্রবন্দর নির্মাণ

বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারের আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে হলে চট্টগ্রামের সমুদ্রতট বরাবর ২০২১ সাল নাগাদ একটি মহাবন্দর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ মহাবন্দর বাংলাদেশসহ নেপাল, ভুটান, ভারতের পূর্বাঞ্চল, মায়ানমার ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সঙ্গে নৌসংযোগ রক্ষা ও সেবাদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে মাল খালাসে অল্প সময় ব্যয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সবচেয়ে কর্মদক্ষ বন্দরে সাধারণত দিনে একটি জাহাজ), এতদঞ্চলের (যেমন ব্যাংকক বা শ্রীলঙ্কার) তুলনায় কম হ্যাণ্ডলিং চার্জ, দ্রুত কাস্টম্‌স্ ক্লিয়ারিং (এখন যেখানে ১১.৭ দিন লাগে সেখানে মালয়েশিয়ার মতো ৩ দিন কি আরও কমে) সম্ভব করে তুলতে পারলে এই অঞ্চলে আমাদের বন্দর ব্যবসায়ী-বণিকদের কাছে 'পোর্ট অফ কল্' (যে-বন্দরে সবচেয়ে কম সময়ে জাহাজ ভেড়া, মাল নামানো, রসদ, জ্বালানি সংগ্রহ করা, মাল নেওয়া ইত্যাদি সকল কর্ম স্বল্পতম সময়ে নিষ্পন্ন হয়) হিসেবে গণ্য হবে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের জন্য অনুকূল অবস্থায় রয়েছে। এ-সব দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের জন্য সুযোগসুবিধা তৈরির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের নৌপথ ব্যবহার করে, বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য করে তাদের কত সুবিধা হয় তা তুলে ধরতে হবে। তবে তার জন্য রাজনৈতিক ও প্রাকৌশলিক কিছু গুরুতর সমস্যা সমাধানের দরকার হবে। মহাসমুদ্রবন্দর স্থাপনের চিন্তাভাবনায় আমাদের অঙ্গীকার বিষয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোকে আগাম ইঙ্গিত না দিলে আমরা কাজ শুরু করতে পারব না।

৬.৩ সুপার হাইওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে মহাসমুদ্রবন্দরের সংযোগস্থাপন

সার্কভুক্ত দেশসমূহের ভেতরে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে যে হাইওয়ে নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে, তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সঙ্গে নেপাল, ভুটান, পূর্ব-ভারত ও ক্রমশ মায়ানমার, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন ও থাইল্যাণ্ডকে এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করার লক্ষ্যে হাইওয়ে নির্মাণ করতে হবে। এই ধরনের হাইওয়ে ও রেলওয়ে নেটওয়ার্ক মহাসমুদ্রবন্দরকে আকর্ষণীয়ভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য সফল করে তুলবে। এই হাইওয়ে নেটওয়ার্ক যাতে দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে, কারণ তাহলেই ক্রমশ আমরা একটি দক্ষিণাপথের মাধ্যমে মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড ও চীন পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারব।

৬.৪ মহাসমুদ্রবন্দরের কাছাকাছি একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ

মহাসমুদ্রবন্দরকে উপযুক্ত সহায়তা দানের জন্য এর কাছাকাছি একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপন করতে হবে। উড়োজাহাজের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুবিধা এবং হোটেল বা থাকার বন্দোবস্তসহ এই বিমানবন্দর অচিরেই আঞ্চলিকভাবে আকাশপথের এক যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতে পারে। টোকিও, ওসাকা, বেইজিং, সাংহাই প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে এই বিমানবন্দর অন্য সার্ক বিমানবন্দরগুলোর ওপর থেকে চাপ কমাবে।

৬.৫ মঙ্গলা নৌবন্দরের উন্নয়ন ও সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ

হাইওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে মঙ্গলা বন্দরকেও তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—তার ফলে নেপাল, ভুটান ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসা ও সে-সব জায়গায় পরিবহণযোগে পাঠানোর ক্ষেত্রে এক বিকল্প সংযোগপথ তৈরি হবে। তা সম্ভব করে তুলতে মঙ্গলার বর্তমান বন্দরসুবিধাদি প্রভূত পরিমাণে উন্নত ও সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬.৬ তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিনির্ভর সেবাখাতকে আরও বেশি সমর্থন জোগাতে সাইবার পার্ক গড়ে তোলা

তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিনির্ভর সেবাখাতের অবদানকে দুভাবে দেখা যেতে পারে : প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা বোঝা যাবে এই খাতপ্রসূত কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন ও রপ্তানিজাত আয়ের দিকে লক্ষ করলে। আর অপ্রত্যক্ষভাবে এর অবদান প্রতিফলিত হবে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতাবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতার উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপ্তিসাধনে অন্যান্য খাতের প্রতিযোগিতা ও আয়তন বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিনির্ভর নতুন নতুন সেবাখাতের উদ্ভব ও তজ্জাত বাড়তি ফলাফলের ক্ষেত্রে। তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি সম্পৃক্ত নানান অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা আহরণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। অধিকন্তু, তথ্যনির্ভর নবোত্থিত বাজারে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে নিতে চাইলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবকাঠামো নির্মাণ করে সাইবার পার্কের শিল্প চালু করতে হবে। এই সাইবার পার্কগুলো নিরাপত্তা (ভৌত ও ডিজিটাল উভয়ই), যথার্থ নিয়ন্ত্রণপ্রসূ কাঠামো, অব্যাহতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া ইত্যাদি সবকিছুই বাড়াবে।

৬.৭ সারা দেশব্যাপী অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা

যে-কোনো ধরনের বিনিয়োগের—দেশী ও বিদেশী—জরুরি পূর্বশর্ত হল শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক খাত যাতে নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসংগত মূল্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পায় তা নিশ্চিত করা। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে যদি আমরা একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে বর্তমান বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বল্পতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। সে-ক্ষেত্রে এই খাতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে হবে যাতে ৫০০০ মেগাওয়াটের মতো অনেক নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র (ভালো হয় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে করতে পারলে), স্থাপন করা যায় এবং ২০২১ সাল নাগাদ সারা দেশ জুড়ে চাহিদা মেটানোর মতো কমপক্ষে পাঁচটি উৎপাদনকূপ ও দুটি অনুসন্ধানকূপ খননের ব্যবস্থা করা যায়। প্রতিযোগিতাভিত্তিক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির হাতে সরবরাহভার অর্পণ করে বিদ্যুৎখাতকে উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.৮ আঞ্চলিক জ্বালানি-বাজারের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ সাধন

বিভিন্ন ক্ষেত্রের সীমানা যখন উন্মুক্ত হচ্ছে, এই অঞ্চলে এক ঝাঁক হাইওয়ে এদিক-ওদিক

বিভিন্ন ক্ষেত্রের সীমানা যখন উন্মুক্ত হচ্ছে, এই অঞ্চলে এক ঝাঁক হাইওয়ে এদিক-ওদিক সবখানে যাচ্ছে, তখন আমরা প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করতে পারি—যা রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূলে এনে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের পরিকল্পনা তৈরিতে আঞ্চলিক নদী-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হবে।

সবখানে যাচ্ছে, তখন আমরা প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করতে পারি—যা রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূলে এনে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের পরিকল্পনা তৈরিতে আঞ্চলিক নদী-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হবে। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপরিসীম ক্ষমতা এ অঞ্চলের রয়েছে। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে বাংলাদেশ তার বর্ধিষ্ণু বিদ্যুৎচাহিদা মেটাতে পারে—নেপাল, ভুটান ও ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক সমঝোতায় কোনো এক আঞ্চলিক বিদ্যুৎগ্রিডের আওতায় এসে। এ ব্যাপারে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬.৯ পুঁজিবাজারের বিস্তৃতি সাধন ও গভীরতা বৃদ্ধি

আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও পুঁজিবাজারের উপকরণ রয়েছে এমন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে হবে। দুর্বল ব্যাবসাসম্পদগত কাঠামোর কারণে ছোটখাটো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত প্রথাগতভাবে পরিচালিত ব্যাংক থেকে টাকাপয়সা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তারা যাতে বিকশিত হতে পারে এবং বাংলাদেশেই ভিত্তি গেড়ে বসতে পারে সেজন্য তাদেরকে সহজে পুঁজির উৎস (যেমন ঋণ ও সমপরিমাণ পুঁজি) খুঁজে পেতে সাহায্য করতে হবে। গভীরতাসম্পন্ন ও বিস্তৃত এক পুঁজিবাজার (ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টক এক্সচেঞ্জ) এবং তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর পুঁজি (অর্থাৎ আমরা মাঝারি-আয়ের দেশ হতে পারলে) বাংলাদেশে ব্যাবসা বিকশিত করার জন্য এ-সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেবে।

সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুদ্রা বিনিময়ের হারকে একটি অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। এতে করে একদিকে মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা থাকে, অন্যদিকে আবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকটি ভালোভাবে সামাল দেওয়া যায়। সে হিসেবে ঝুঁকি হ্রাসমূলক বিনিময় বাজার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে (সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 'যৌথ এশীয় ঝুঁকি হ্রাসমূলক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা'র আদলে) একটি ঝুঁকি হ্রাসমূলক তেজি পণ্য-বাজার গড়ে ওঠা সম্ভব। এরকম বাণিজ্যব্যবস্থা বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়াতেই নিষ্পন্ন হতে পারে, যাতে করে অপ্রয়োজনীয় সময় ধরে গুদামজাত করার খরচ বাঁচানো যায় ও পুরো লেনদেনের ক্ষেত্রে একান্ত স্বচ্ছতা থাকে। একইসঙ্গে আমাদের মূলধন বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে আর্থিক খাতে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা সম্ভবপর হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে আর্থিক সেবাখাতের ক্ষেত্রে ব্যাবসা-প্রক্রিয়া-আউটসোর্সিং-বাজারে সুযোগের দ্বার আরও উন্মুক্ত হবে।

৬.১০ যথোপযুক্ত শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণ দান

স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা ও গুণগত মান বাড়াতে হবে, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রশ্নে। বিদেশী ভাষা শেখানো (যেমন চীনা, কোরিয়ান, জাপানি ভাষা প্রভৃতি) হলে তা কণ্ঠস্বর-নির্ভর ব্যাবসা-প্রক্রিয়া আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার শনাক্ত করার কাজে দেবে। ব্যবস্থাপনা-সক্ষমতার জোগান দেওয়াও একটা বড়ো ব্যাপার। যে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এক আঞ্চলিক শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র (বিশদ আলোচনার জন্য অভীষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য) হিসেবে গড়ে উঠবে তার জোগান নিশ্চিত করতে হলে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহল—বিভিন্ন ধরনের কর্মীকে (দক্ষ বনাম স্বল্পদক্ষ; উন্নত পর্যায়ের দক্ষতা/তত্ত্বাবধায়ক বনাম উন্নত পর্যায়ের দক্ষতা/ব্যবস্থাপক) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। উপরন্তু, আমাদের পুঁজিবাজারকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পেশাদারি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সংঘ তৈরি করতে হবে যাতে প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেওয়া যায়। ব্যাবসায়িক উদ্ভাবনাসমৃদ্ধ মানসিকতা ও ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করার চ্যালেঞ্জ এখন আমাদের সামনে।

৬.১১ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির কার্যকর একীভবন

২০২১ সাল নাগাদ বর্ধনশীল দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে যথোপযুক্ত নীতিমালা তৈরির মধ্য দিয়ে সাফ্‌টা চুক্তিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাজার পাওয়া, পণ্যের উৎপত্তিস্থল সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে তাকে আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা এবং আন্তরাঞ্চলিক বিনিয়োগপ্রবাহে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভবপর হয়। বিশ্ববাজার ধরার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা (Guaranteed buy back scheme) লাভ করতে হবে, একইসঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সম্প্রসারণোন্মুখ সাফ্‌টা চুক্তির সঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্যচুক্তিবদ্ধ সংস্থা (যেমন ASEAN)-এর ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সেবাখাতে ব্যাবসাবাণিজ্যকে সম্পৃক্ত করার জন্য পণ্য ও পুঁজিসঞ্জাত অর্থনৈতিক সহযোগিতা ক্রমশ বিস্তৃত করতে হবে। কার্যকর আন্তঃবঙ্গোপসাগরীয় বহুমুখী কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার উদ্যোগ (BIMSTEC) ASEAN বাজার পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই অবদান রাখবে। ২০২১ সালের মধ্যে সাফ্‌টা একটি কাস্টম্‌স্ ইউনিয়নে উন্নীত হবে। পৃথিবীতে যে-পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করবে তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হবে দক্ষিণ-দক্ষিণ রপ্তানিবাণিজ্য।

অভীষ্ট ৭

টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা

আগামী ১৫ বছরের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, নগরায়ণের পরিধিবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশের কারণে পরিবেশগত বহু পরিবর্তন বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, যেমন—ভূমি নষ্ট হওয়া ও শিল্পকারখানার বর্জ্যজনিত পানিদূষণ বাড়বে, রাস্তার নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা ও বিষাক্ত বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, এবং আমাদের পানি ও উপকূলীয় সম্পদ রিক্ত হতে থাকবে। বাতাসে ও পানিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ও প্রাকৃতিক লালনক্ষেত্র কমতে থাকায় (প্রধানত বনভূমি ধ্বংস ও জলাভূমির আগ্রাসনে) আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশে বেশ কিছু পরিবেশগত প্রতিকূলতার প্রভাব পড়বে। এইসব প্রতিকূল ঘটনাদির দিকে লক্ষ্য না রাখা গেলে এবং সেগুলোর প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া গেলে আমাদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার চিন্তাভাবনায় অনেক ছাড় দিতে হবে। তদুপরি, উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পদ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রাপ্য তা ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করব। পরিবেশের আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কৌশল তাই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার, সচেতন নাগরিক সমাজ ও দায়িত্বশীল ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে। অভীষ্ট সিদ্ধির পথে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয় যা হওয়া উচিত সে-সবের কয়েকটি নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা নীচে লিপিবদ্ধ করা গেল।

৭.১ কার্যকর নগর-পরিকল্পনা

২০২১ সাল নাগাদ দেশে শহরাঞ্চল এখনকার তুলনায় আয়তনে দ্বিগুণ হবে। ফলে শহরগুলোয়, বিশেষ করে ঢাকায়, জনসংখ্যার ঘনত্ব অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়ে যাবে। এই ঘটনা আমাদের নগরপরিকল্পক ও পরিবেশবিদদেরকে দারুণ এক পরীক্ষার মুখে ফেলে দেবে। এ-ক্ষেত্রে দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত, আগামী দশ বছরে ঢাকা শহরকে আমরা কীভাবে বেড়ে উঠতে দেখতে চাই তা মাথায় রেখে পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনা দাঁড়াবে সকলেরই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে—রাজনীতিবিদ, সরকার, কর্পোরেশন, এনজিও এবং সর্বোপরি ঢাকাবাসী—এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবারই ভূমিকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, ঢাকার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে দেশের সর্বত্র এলাকাভিত্তিক নগরকেন্দ্র বা 'নিবিড় শহরাঞ্চল' তৈরি করতে হবে—বিশেষত বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর (অভীষ্ট ৩ ও ৬ দ্রষ্টব্য) কাছাকাছি। দেশ জুড়ে নগরায়ণের মাত্রা অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় আমাদেরকে ঢাকা শহরের বাইরে কার্যকর নগর-পরিকল্পনার মাধ্যমে নাগরিক সেবার সব রকম সুযোগসুবিধা ছড়িয়ে দিতে হবে। সুব্যবস্থাপনায় নগরায়ণ-প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য সবচেয়ে জরুরি হল কার্যকর নগরপ্রশাসন থাকা; তার জন্য দরকার হবে বিকেন্দ্রিত স্থানীয় নগর-সরকার গঠন। এই নগর-সরকারগুলো সহায়তা পাবে বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও/জনসমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-দের কাছ থেকে, যারা গৃহায়ণ, পরিবহণ, উপযোগ-উপকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগসুবিধা দান ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয়ভাবে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে।

৭.২ বায়ুদূষণ রোধ

২০২১ সালের ভেতরে যে-সব নগরকেন্দ্র ও বিপুলায়তন মহানগরী সারা দেশে গড়ে উঠবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুদূষণ কমানোর জন্য সরকারকে অত্যন্ত কড়া কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। বায়ুদূষণের পশ্চাতে যত কারণ আছে সে-সবের ভেতরে সবচেয়ে বড়ো কারণ হল যান্ত্রিক যানবাহন। সুরাহা করতে হলে সরকারকে কিছু কর্মপরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে, যেমন—বড়ো শহরগুলোয় সার্বিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সক্ষম ও নির্ভরযোগ্য নগর-পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কলকারখানাকে শহর এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া, এবং গাড়িতে সিসাযুক্ত পেট্রোলের ব্যবহার কমানো, ডিজেলের মান উন্নত করা, গাড়িতে কালো ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ করা। এমন আইনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যার ফলে পরিবেশরক্ষক নিয়মকানুনগুলি যদি পরিবেশ-প্রতিকূল কলকারখানা মান্য না করে তাহলে তাদের ব্যাবসা বন্ধ করে দেওয়া যায়। বাতাসে সিসা, ধুলোবালি ও কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের নীতি স্বল্পমেয়াদি সময়ের জন্য হাতে নিতে হবে। সরকার ও নাগরিকবৃন্দ উভয়কেই যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে শহরের বাতাস দূষণমুক্ত হয়ে নির্মল থাকতে পারে, নইলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সরকার ও বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণের দায়িত্ব বর্তাবে উড়াল রেল ব্যবস্থা তৈরি করা বা বিদ্যুৎচালিত বাস, অন্ততপক্ষে ঢাকা শহরে, নামানো যায় কি না—এ-সব বিষয় বিবেচনা করার জন্য—কারণ ২০২১ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে সবচেয়ে ঘিঞ্জি এক বিপুলায়তন মহানগরী হয়ে দাঁড়াবে এই ঢাকা শহর। রাস্তায় নিত্যনতুন মোটরগাড়ির সংখ্যা কমবে, যদি নগরকেন্দ্রগুলোয় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্ভব করা যায়।

গৃহাভ্যন্তরের বায়ুদূষণ কমানোও অগ্রাধিকার পাবে। বাড়ির ভেতরের এই বায়ুদূষণ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতাবৃদ্ধি স্বল্পমেয়াদি কৌশলের মধ্যে পড়বে। আবার, প্রত্যেক বাড়িতে যদি গ্যাস/বায়োগ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ হ্রাসে সাহায্য হবে।

৭.৩ পানিদূষণ রোধ

সামনের বেশ কিছু বছর সরকারের পরিবেশ বাঁচাও কর্মযজ্ঞের একটা বড়ো অংশ নদী পরিষ্কারের পেছনে ব্যয় করতে হবে যাতে সর্বপ্রকার পানিদূষণ দূর করা যায় ও নদীতট দখল ঠেকানো যায়। ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, অগত্যা পানির বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, চাষাবাদ ও কলকারখানার কাজকর্ম ইত্যাদির চাপে যখন পানির গুণগত মান এখনকার চেয়ে আরও বেশি খারাপের দিকে যাবে, তখন পরিষ্কার পানি—বিশেষত নির্মল পানীয় জল—পাওয়া বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার সমাধান করাই হবে তখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। পানিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন-না আমরা ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মান নিশ্চিত করে আমাদের নদীগুলোর অবস্থার উন্নতি করতে পারব ততদিন ভূগর্ভস্থ জলের বিকল্পে ভূপৃষ্ঠস্থ জলের শোধনপ্রক্রিয়া (জলশোধনের সস্তা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে) অসম্ভব হয়েই থাকবে। ভূপৃষ্ঠস্থ পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ধারণ ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ দুটি কারণেই আমাদেরকে একটি জাতীয় পানি-নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নদী দখলের প্রবণতা রোধ করা না গেলে তা দেশের বর্ধমান জনসংখ্যা ও প্রসারোন্মুখ শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অভূতপূর্ব উপায়ে বাড়তেই থাকবে। খাস জমির সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা বা ক্রমস্ফীত শহুরে লোকসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে আবাসনের জমি ও সেইসঙ্গে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার স্থান চিহ্নিত করে দিতে পারলে তবেই এ জাতীয় আগ্রাসন বন্ধ করা যাবে। সেজন্য জনগোষ্ঠীর কোনো কোনো অংশ যাতে কম খরচে ঘরবাড়ি (অর্থাৎ আবাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে) পায় তার ব্যবস্থা বড়ো আকারে নিতে হবে। মোদ্দা কথা, বসবাসের অযোগ্য বস্তিতে গিয়ে মানুষজনকে যাতে না থাকতে হয় সেজন্য প্রয়োজন

সামাজিকভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর বাসস্থান ঘিরে আবাসন পরিকল্পনা নেওয়া। আমাদের মহানগরীসমূহে যাদের প্রবল উপস্থিতি দৃশ্যমান সেই নারী শ্রমিকদের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ গৃহায়ণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। কলকারখানার জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার একটি নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে পরিবেশ রক্ষার মান বজায় রেখে যে-সব শিল্পকারখানা চালু আছে তাদেরকে খাস জমি দেওয়া যায়। পরিবেশ সংক্রান্ত একই মান ও আইনকানুন সকলের জন্যই প্রযোজ্য হবে, তার ভেতরে ইপিজেড এলাকা ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (আগামী দশ বছরের মধ্যেও যা স্থাপিত হবে) পড়বে (দ্রষ্টব্য অভীষ্ট ৩)।

৭.৪ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় নির্দিষ্ট জলাভূমি সংরক্ষণ

আমাদের জলাভূমি এবং তৎসম্পৃক্ত মৎস্য উৎপাদনক্ষেত্রের যে-বিশাল এলাকা রয়েছে, উভয়ই পলিজাত নদীভরাট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণজনিত হস্তক্ষেপে (যেমন নদীতটে বাঁধ তৈরি, স্লুইস গেট তৈরি ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে জলাভূমির সংরক্ষণ ও বিবেচনাপ্রসূত নিয়মিত ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেবে। সে কারণে পুকুরে মাছ চাষ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে ও সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদনের প্রাকৃতিক পরিবেশানুকূল ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে। যাদের জীবন-জীবিকা এর ওপর নির্ভরশীল তাদের উপকারের জন্য কৃষি ও পানিসম্পদের ক্ষেত্রে জমির যথাযোগ্য এলাকা নির্ধারণ করতে হবে। আমরা যে অব্যাহতভাবে জলাভূমিকে কৃষিকাজে, কলকারখানা নির্মাণে ও বাসস্থানের জন্য ঘরবাড়ি তৈরিতে ধ্বংস করে চলেছি আইন প্রণয়ন করে তা বন্ধ করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭.৫ আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা

পানি, বিশেষত বন্যাজল, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকলেরই উপকার হবে এমন ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, ভারতে ও নেপালে যে-সব বাঁধ ও জলাধার তৈরির প্রস্তাব রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে হবে; কারণ, তারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও শুকনো মরসুমে ভাটির পানিপ্রবাহ বৃদ্ধিতে বাড়তি উপকার পাবে বাংলাদেশ। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এখনই বাংলাদেশের শুরু করা উচিত এই লক্ষ্যে যে, আগামী বছরগুলোয় আমাদের নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ ঠিক রাখার নিশ্চয়তা তারা দিক। এ ধরনের আলোচনা শুরু করতে বিলম্ব ঘটালে নদীতে পানিপ্রবাহ ঠিকমতো পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে দীর্ঘমেয়াদিভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকাকে পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য একটি আঞ্চলিক পানি কর্তৃপক্ষ (যেমন মেকং অববাহিকা কর্তৃপক্ষ রয়েছে) গঠন করা।

৭.৬ ভূমির উৎপাদনক্ষমতার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

আগামী ১৫ বছরে ফসল উৎপাদন বাড়াতে ও অব্যাহত রাখতে হবে, নইলে কৃষিজমির

সামনের বেশ কিছু বছর সরকারের পরিবেশ বাঁচাও কর্মযজ্ঞের একটা বড়ো অংশ নদী পরিষ্কারের পেছনে ব্যয় করতে হবে যাতে সর্বপ্রকার পানিদূষণ দূর করা যায় ও নদীতট দখল ঠেকানো যায়। ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, অগত্যা পানির বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

এখন যে নাজুক অবস্থা তা থেকে দেশের মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে আমরা পারব না। আমাদের পরিবেশগত মুখ্য চ্যালেঞ্জই হবে জমিক্ষয় রোধ করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো। তার জন্য দু-ধারার কৌশল কাজে লাগাতে হবে : প্রথমত, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সারের অধিক ফলপ্রসূ ব্যবহার শেখানোর জন্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া; এবং দ্বিতীয়ত, বর্ধিত ফলন ও জৈব সারের ব্যবহার (জৈব সার প্রয়োগ করে চাষাবাদ বাড়ানো প্রসঙ্গে অভীষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে জ্ঞাত করা।

৭.৭ শিল্পকারখানা, হাসপাতাল ও গার্হস্থ্য বর্জ্যের পরিবেশগতভাবে নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

ঘরবাড়িতে ও অফিস-আদালতে বর্জ্যের নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আরও ভালোভাবে করার গণপ্রচারণা অব্যাহতভাবে করতে হবে। এই গণপ্রচারণার একটি বিষয় হবে জৈব ও অজৈব বর্জ্য পৃথক করা অথবা কাগজ প্লাস্টিক কাচ ইত্যাদি পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ার সুফল মানুষজনকে সম্যকভাবে জানানো। সচেতন নাগরিকবৃন্দের দাবি পূরণের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে সরকারকে বর্জ্য নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দক্ষ পরিচালন-ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। নিয়মিতভাবে বর্জ্য পরিষ্কার করা, গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে সুপরিচালিত পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি এই দায়িত্বের অংশ হবে। কলকারখানা ও হাসপাতালের ক্ষতিকর বর্জ্যের যেন ঠিকমতো ব্যবস্থা করা হয় এবং গার্হস্থ্য বর্জ্য থেকে সেগুলোকে পৃথক করে নেওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন দরকার হবে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যে-সব দ্রব্যের পরিবেশগত প্রতিকূল প্রভাব রয়েছে সে-সব রপ্তানিকারী দেশের পণ্য বর্জন করার আন্দোলন পরিবেশ-সচেতন দেশসমূহে ক্রমশ বাড়ছে; তার ফলে আমাদের দেশে রপ্তানিনির্ভর শিল্পকারখানায় পরিবেশ-অনুকূল দায়িত্বশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করার গুরুত্বও ক্রমাগত বেড়ে যাচেছ।

৭.৮ জ্বালানির ব্যয়-সাশ্রয়ী বিকল্প উৎস

সারা দেশে জ্বালানি সরবরাহ উন্নত করার (অভীষ্ট ৩ এবং অভীষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য) যে লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করেছি, তা অর্জনের জন্য বেসরকারি ও এনজিও খাতে নবায়নযোগ্য (যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পানিসম্পদ) জ্বালানির বিকাশ ও বিতরণব্যবস্থা গড়ে উঠতে হবে। পানিবিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য উৎসের বিকল্প হিসেবে বহু দেশে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। 'উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা'র অংশ হিসেবে বর্তমান সীমিত জ্বালানি সরবরাহের উপযোগিতা নিশ্চিত করতে সরকারকে অল্প সময়ের ভেতরেই শহরাঞ্চলে গৃহস্থালির কাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করতে হবে; এর ফলে কলকারখানায় বাড়তি বিদ্যুৎ জোগানো সম্ভব হবে। এই মহাপরিকল্পনাতে অর্থনৈতিক অন্যান্য খাতকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল থাকবে। ঐসব খাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে—ছোট ও মাঝারি পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে বিনিয়োগ করা ও সে-সব চালু রাখা, এবং জাতীয় গ্রিড বা অন্যান্য স্থানীয় উৎস (যেমন ডিজেল ইউনিট, বায়ুশক্তি বা সৌরশক্তি ইত্যাদি) থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নেওয়ার কাজ।

প্রযুক্তি আরও উন্নত হওয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি আরও বেশি ব্যয়-সাশ্রয়ী হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে বায়োমাস (biomass) জ্বালানির ওপর নির্ভরতা ও চাপ কমানো। একইভাবে বায়োমাস জ্বালানির জায়গায় বায়ো-ফুয়েল (biofuel), বায়ুগ্যাস সমেত, জনপ্রিয় করবে সরকার। Clean Development Mechanism (CDM—কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশসমূহে দূষণ প্রক্রিয়া কমানোর ক্ষেত্রে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি)-র নীতির সুযোগ নিয়ে সরকার (ক) জ্বালানি-সম্পৃক্ত দক্ষতা, (খ) জ্বালানির বিকল্প উৎসসমূহের উন্নয়ন, ও (গ) দেশে কার্বন-সংরক্ষণশক্তি বৃদ্ধির জন্য বাইরে থেকে আর্থিক সাহায্য আনা নিশ্চিত করবে।

৭.৯ ঘোষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণ

এখন যেভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে সেভাবে চলতে থাকলে ২০২১ সাল নাগাদ বনাঞ্চলের পরিধি বিপুলভাবে কমে যাবে, এবং তার ফলে গাছপালা ও প্রাণীজগৎ উভয়ই কমতে থাকবে বলে জীববৈচিত্র্যের অশেষ ক্ষতিসাধন হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে বনভূমির ওপর গরিব জনসংখ্যার নির্ভরতা কমাতে জ্বালানির বিকল্প উৎসের ও ক্ষেতখামারের বাইরে কর্মসংস্থানের প্রাপ্যতা (অভীষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) বাড়ানোর কথা ভাবা যায়। উপরন্তু, যৌথভাবে সামাজিক দায়িত্বগ্রহণের সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যার ফলে স্থানীয় কোম্পানিগুলো দেশের মধ্যে নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে ইকো-পার্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। এই সমস্ত উদ্যোগ মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডে ফুজিৎসু (Fujitsu) জাতীয় কোম্পানি পরিচালিত উদ্যোগের সমগোত্রীয় হবে—যার দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানি বনায়নের জন্য অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবী জোগাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই শেষ পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষা ও ইকো-পর্যটন ব্যবস্থার জন্য পার্কগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। চট্টগ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলের নানা স্থানে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে, যাতে ইকো-পর্যটনের জন্য বনাঞ্চল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা যায় এবং সেইসঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আয়-উপার্জনের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

৭.১০ কার্যকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বিশ্বব্যাপী উষ্ণীভবনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ আরও উঁচু হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তাপমাত্রা বাড়বে, মৌসুমী আবহাওয়ার ধরন পাল্টাবে এবং সম্ভবত ঘন ঘন না হলেও ঝড়বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে। গ্রামীণ বাংলাদেশে যে-সব অঞ্চল সাধারণত বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে সে-সব জায়গা এ জাতীয় দুর্যোগের প্রক্ষিপ্ত অভিঘাতের (যেমন অনাবৃষ্টি, ঝড়বৃষ্টি, বন্যা) সম্মুখীন হবে। এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কার্যকর সতর্কীকরণ ও লোকজন সরিয়ে আনার ব্যবস্থাদি দ্রুত কার্যকর করতে হবে, দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা স্কিম চালু করতে হবে এবং এসব ব্যাপারে প্রাকৃতিক ও ধনসম্পদের ক্ষতির উদারভাবে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস সরকারকে দিতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ যাতে মরশুমী বন্যা ও অনাবৃষ্টি মোকাবিলা করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকৃত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য দরকার পড়বে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নদী-ব্যবস্থাপনা, সবুজ ভূবৃত্ত (Green Belt) তৈরি, জলসম্পদের দক্ষতর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ বিনিয়োগ এবং শুকনো মরশুমে নদীপ্রবাহ ও জল ধরে রাখার জন্য বিনিয়োগ।

৭.১১ পরিবেশের অভিঘাত নির্ণয় (Environment Impact Assessment—EIA) পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানীকরণ ও কার্যকর প্রয়োগ

দ্রুত শিল্পায়নের এই পৃথিবীতে আমাদের পরিবেশ রক্ষাকে নিশ্চিত করতে হলে এমন এক পদ্ধতি প্রয়োজন যা সকল শিল্পকারখানা এবং শিল্প সংক্রান্ত নয় এমন কাজকর্মের পরিবশগত ঔচিত্য বিচার করে দেখবে। বর্তমানে 'পারিবেশিক অভিঘাত বিচারে'র যে-পদ্ধতি বাংলাদেশে রয়েছে তা অপ্রতুল, কারণ EIA-র ওপর আইনি নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। নিয়মকানুনে ত্রুটি/দুর্নীতি আছে, রয়েছে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও গণসম্পৃক্তির অভাব। পরবর্তী কয়েক বছরে গণসম্পৃক্তির মাত্রা বাড়িয়ে, অধিকতর কার্যকর EIA সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করে EIA পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। EIA সংক্রান্ত আইন স্পষ্টভাবে EIA-র নিয়মকানুন ও অংশীবর্গের দায়িত্ব তুলে ধরবে। সমন্বিত ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া ও বিকল্প পরিকল্পনার সম্ভাব্যতাও এই পদ্ধতি নিশ্চিত করবে। EIA প্রক্রিয়াতে গণসম্পৃক্তিকে একটি আইনি

পূর্বশর্ত হিসেবে নির্ধারণ করলে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। অল্পকালের মধ্যে EIA প্রক্রিয়ার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নজরদারির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এনজিওগুলো এবং/অথবা একজন পরিবেশ-ন্যায়পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষে EIA প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন ও চালু করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর) সামর্থ্য বাড়াতে হবে।

অভীষ্ট ৮

একটি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করা

অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র নির্মাণের কেন্দ্রভূমি হল সামাজিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিকর সমাজ নিশ্চিত করা। নৈতিকভাবে অপরিহার্য, রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় ও অর্থনৈতিকভাবে ন্যায়সংগত সমাজ হিসেবে একে দেখতে হবে। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, আমরা যদি দারিদ্র্য দূর করতে এবং উচ্চপ্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে চাই, তাহলে সম্ভাবনাময় বিশাল ভোক্তাশ্রেণী—শ্রমিক ও পুঁজি-বাজার যাদের কারণে তৈরি হয়ে ওঠে সেই অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে। উন্নয়নের সুফল বঞ্চিতেরা ভোগ করতে না পারলে আমাদের বিকাশ-সম্ভাবনাই শুধু বাধাগ্রস্ত হবে না, আমাদের গণতন্ত্রের জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই অর্থনৈতিক শ্রেণী, নারী-পুরুষ, ধর্ম বা জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকলেই যাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান তৈরির ওপর ভিত্তি করে আমাদের উন্নয়ন-কার্যক্রম গঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও সামাজিক গ্রহিষ্ণুতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নীতিসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এ জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে কাজে লাগবে।

আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকাশ করার মতো আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক সমাজ ২০২১ সাল নাগাদ গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। এমন সমাজে সুযোগসুবিধার গণতন্ত্রায়ন যেভাবে ঘটবে তা হল—ঋণসুবিধা লাভ ও উৎপাদনমুখী সম্পদকে সকলের আয়ত্তগম্য করা, সর্বজনীন ভিত্তিতে সকলকে আর্থিকভাবে লাভজনক কাজ জোগানো, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দান এবং শারীরিকভাবে দুর্বল ও প্রবীণদের সেবাযত্ন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা। নারী-পুরুষ, শ্রেণী, ধর্ম ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে পূর্ণ অংশগ্রহণ ও আইনি রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে হবে।

৮.১ কম সুবিধাভোগী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে উৎপাদনক্ষম সম্পদ পৌঁছানো

সকলেই যাতে পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে সে-লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও দারিদ্র্যের এক সম্ভাব্য সমাধান বের করা যায়। সহায়সম্পত্তির মালিকানাকে সর্বজনীন ও মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উৎপাদনক্ষম সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বঞ্চিত মানুষজন কষ্ট পায়, বাজার-অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণে তাদের সামর্থ্য সীমিত হয়ে পড়ে। পরিশ্রমী গরিব মানুষদের সামনে উপার্জনের সুযোগ এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অল্প সংগতিপন্ন দরিদ্রেরা যাতে সর্বজনীনভাবে ক্ষুদ্রঋণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে; এ-ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে সম্পূর্ণ বিত্তহীন পরিবারের ক্ষুদ্রঋণ পাওয়ার ওপর। এ ছাড়া অল্প সংগতিপন্ন দরিদ্র মানুষ যাতে অর্থনীতির বর্ধিষ্ণু অন্যান্য খাতে অংশ নিতে পারে সেজন্য ক্ষুদ্রঋণজাত সুবিধার বাইরে গিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। উন্নয়নের গতিপ্রবাহে অংশ নেবার জন্য বঞ্চিত মানুষদের হাতে ব্যাপক মাত্রায় সুযোগসুবিধা তুলে দিতে হলে উৎপাদনক্ষম সম্পদকে তাদের আয়ত্তগম্য করতে হবে। এ-সব সুযোগসুবিধা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তিকে যেমন প্রসারিত করবে তেমনই আয়বৈষম্য কমিয়ে আনবে। সহায়সম্পদের মালিকানা ক্রমে অর্থনীতির ব্যষ্টিক থেকে মধ্যবর্তী (Meso) খাত হয়ে কর্পোরেট খাতে প্রবাহিত হবে। বিশ্বায়নের যুগে সামষ্টিক অর্থনীতি সঞ্জাত বিস্তৃততর সুযোগসুবিধা লাভে বঞ্চিত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করাই আমাদের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

গ্রামাঞ্চলে সম্পদের মালিকানা বিস্তৃত করতে নীতিমালা তৈরি ও বিশেষ কর্মোদ্যোগের প্রয়োজন পড়বে যাতে সরকারি মালিকানায় উৎপাদনক্ষম সম্পদ যা রয়েছে তা এখনই দখলমুক্ত বা তার ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সে-সব সম্পদবঞ্চিতদের ভেতরে বণ্টন করে দেওয়া যায়। যেমন, দশ লক্ষ একর খাস জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষিকাজ ও বাসস্থানের জন্য সে-সব ভূমিহীনদের মধ্যে সরকার বিতরণ করতে পারে। অধিকন্তু দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়কে উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে জলমহাল নীতি অনতিবিলম্বে সরকারকে প্রয়োগ করতে হবে। ভূমিহীনদের বিভিন্ন দলে সংঘবদ্ধ করে গভীর ও অগভীর নলকূপের স্বত্ব ও ব্যবহারের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে, তাহলে তাদের উপার্জনের একটা সুযোগ হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়আশয়ের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্বপুরুষের জমিজমা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় তাদের দাবি যাতে তারা বহাল রাখতে পারে সেজন্য কার্যকর নীতি চালু করতে হবে। যেমন, 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার স্কিম' চালু করলে ইকো-পর্যটনের জন্য তাদের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত জমি উন্নয়নে তারা দিনমজুর খাটার সুযোগ পেতে পারবে। অন্যের সম্পত্তি অপচয় না করে ভোগদখল বা মালিকানার অধিকার, বিশেষত তাদের পৈতৃক ভিটেয় স্থাপিত বনসম্পদভিত্তিক প্রকল্পতে অধিকার, তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তারা প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক উন্নয়ন থেকে উদ্ভূত আয়-উপার্জনের সব রকম সুযোগসুবিধার সুফল ভোগ করতে পারবে।

৮.২ শ্রমজীবী ও বঞ্চিতদের কর্পোরেট মালিকানার অধিকার

বাজার-অর্থনীতিতে আধুনিক দ্রুত বিকাশমান খাতসমূহে অংশগ্রহণ করার সুযোগ যাতে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত মানুষজন ও নিম্ন আয়ের চাকুরিজীবীরা পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের সমতাভিত্তিক অবস্থান সম্ভব করে তুলতে হবে। শ্রমসেবায় নিযুক্ত মানুষদের অর্থে যেখানে মূল্যসংযুক্তির একটা বড়ো অংশ গড়ে উঠেছে সে-সব শ্রমজীবীনির্ভর সংস্থাগুলোতে এই নীতি প্রযুক্ত হবে। এ-সব সংস্থায় শ্রমজীবীদের ভোক্তাশ্রেণীতে উন্নীত করা গেলে সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যেমন তৈরি হবে তেমনই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে। যত বেশি সংখ্যক লোক মালিকানা-স্বত্ব পাবে এবং পুঁজি-মালিকানা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশে ভাগ নিতে পারবে, ততই তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। বাজার-চাহিদা এভাবে বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ প্রশ্রয় পাবে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও অধিক অর্জিত হবে।

প্রধান কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানাদিতে সমতাভিত্তিক অবস্থান পাওয়ার জন্য আয়বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর সামনে সুযোগ এনে দিতে হবে। একইভাবে, অর্থনীতির কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে সমতাভিত্তিক অংশ দিয়ে প্রাথমিক উৎপাদন ও শ্রমশক্তিতে সংযুক্ত মূল্যের অংশ লাভে ক্ষুদ্র চাষীদের সুযোগ দিতে হবে। কর্পোরেট সম্পদের মালিকানা বিস্তৃত করার এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন দিতে হলে আমাদের যা করতে হবে, তা হল—বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যেমন নিম্ন আয়ের মানুষদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিউচুয়াল ফাণ্ড, সেইসঙ্গে কেবল বঞ্চিত শ্রেণীর মালিকানাধীন বিশেষ ধরনের নানা সামাজিক সংস্থা। এই নতুন ধরনের পৃষ্ঠপোষকদের মালিকানা স্বত্ব অবলিখন করে দিতে হলে আমাদেরকে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদি বিকশিত করতে হবে, যেখানে বঞ্চিতদের হাতে যৌথ সমতাভিত্তিক দায়দায়িত্ব অর্পণের লক্ষ্যে অনুদানজাত ও বাজার থেকে আহৃত অর্থে ঋণদানের ব্যবস্থা

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়আশয়ের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্বপুরুষের জমিজমা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় তাদের দাবি যাতে তারা বহাল রাখতে পারে সেজন্য কার্যকর নীতি চালু করতে হবে। যেমন, 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার স্কিম' চালু করলে ইকো-পর্যটনের জন্য তাদের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত জমি উন্নয়নে তারা দিনমজুর খাটার সুযোগ পেতে পারবে।

থাকবে। ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের এমন এক সমাজ গঠন করতে হবে যেখানে সম্পদবঞ্চিত একটি বড়ো শ্রেণী জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, কর্পোরেট খাত ও ভূ-সম্পত্তিতে মালিকানাস্বত্ব অর্জন করতে পারে। তার পরিমাণ এতখানিই হতে হবে যাতে মনে হয় বাংলাদেশের সামাজিক বিন্যাস একটি অধিক ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতাভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে।

৮.৩ দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তাবলয়

সমাজের কিছু নাজুক অংশ (যেমন বৃদ্ধবয়সী, পঙ্গু, বিধবা, অনাথ ও আজীবন অসুস্থ মানুষজন) যেন সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারেরই দায়িত্ব হবে। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে ন্যূনতম অন্নবস্ত্র-আবাসের সংস্থান, শিক্ষা দান ও স্বাস্থ্যভাতা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক ধরনের গোষ্ঠীর জন্য বসবাসের ব্যবস্থায় বিশেষ সহযোগিতা দান করতে হবে। যেমন, দেশ জুড়ে বৃদ্ধনিবাস, পঙ্গু ও অনাথ শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের বোর্ডিং স্কুল তৈরির ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুযোগসুবিধা দানের ক্ষেত্র শনাক্ত ও তাতে সহযোগিতা করার ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই অর্থতহবিল জোগাড় করা সহজতর করতে হবে এবং ঐসব সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে প্রশাসনব্যবস্থাকেও অর্থায়নে সহযোগিতা করতে হবে। চিররুগ্ণ ব্যক্তিদের জন্য সৃজনশীলভাবে স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন স্কিম তৈরি জরুরি হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, অল্প সংগতিপন্ন দরিদ্রেরা যাতে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য মুনাফাহীন দলভিত্তিক বীমা স্কিম প্রণয়ন করতে হবে। এ ধরনের স্কিম তৈরিতে দেশের বীমা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

অবকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ ও সহায়ক কাজকর্ম যেন পঙ্গুদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন বিশেষ ধরনের নীতিমালা তৈরি ও সম্পদ বরাদ্দ রাখতে হবে—যাতে পঙ্গু ব্যক্তি তার পঙ্গুত্বের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়।

৮.৪ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের নারীসমাজ তার সুপ্ত ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার ও জাতীয় উন্নয়নে অধিক কার্যকর অবদান রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এই ত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে সমাজে নারীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠায় জাতীয় নীতিমালা, বরাদ্দসংক্রান্ত অগ্রাধিকার এবং আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ নারী-পুরুষের বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হলে আমাদেরকে এগুলো নিশ্চিত করতে হবে: উৎপাদনের ক্ষেত্রে (জমিজমা, পুঁজি, অর্থায়ন, যন্ত্রপাতি) নারীর লক্ষযোগ্যভাবে মালিকানাবৃদ্ধি এবং/অথবা তার প্রবেশাধিকার; এবং সেইসঙ্গে শিক্ষা ও দক্ষতাবিকাশের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ লাভ করা। শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ বিষয়ে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতাবিধান, বিশেষত উচ্চ স্তরে, নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে; তার ফলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রুত বিকাশমান নানা ক্ষেত্রে চিরাচরিত চাকরিবাকরির বাইরেও বিচরণ করার যোগ্যতা তারা অর্জন করবে। তা ছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে সমাজে যে-বদ্ধমূল কিছু ধারণা রয়েছে সে-সবের ইতি ঘটবে এবং শ্রমবাজারে নারীর অগ্রগমনের সুযোগ-সম্ভাবনার উন্নতি ঘটবে।

সুযোগ পেলে মেয়েরা তার সদ্ব্যবহার করতে জানে—এটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: শিক্ষাব্যবস্থায় ও শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে যা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রতিকূল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণ প্রতিরোধ করতে হবে। নারী-পুরুষের গতানুগতিক ভূমিকা নিয়ে ছেলে ও মেয়ে দু-দিকেই মনের যে-ধাঁচ তৈরি হয়ে আছে তা পাল্টানোর শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে, এবং আমাদের সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যাতে পূর্ণতর অংশগ্রহণ মেয়েরা করতে পারে তার জন্য তাদেরকে সহযোগিতা করা ও যোগ্য করে তোলার গুরুত্ব আমাদের অনুধাবন করতে হবে। জনজীবনে অংশ নেওয়ার জন্য নারীর অপ্রতিবন্ধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে; তার জন্য প্রয়োজন নারীনির্যাতনের ঘটনা কার্যকরভাবে বন্ধ করা।

নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এমন আইন দরকার; মাঠেঘাটে কি নিজের বাড়িঘরে যে-কোনো বয়সের নারী যাতে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে সেই বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থাদির পেছনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা দরকার; উপরন্তু আরও প্রয়োজন হবে—দেশব্যাপী নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার জন্য নীতিমালা তৈরি করা।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সর্বত্র প্রশাসনের সর্বস্তরে সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নারীসমাজ যাতে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে তার জন্য মেয়েদের যাবতীয় প্রস্তুতিগ্রহণ ২০২১ সালের ভেতরে নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অভীষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।)

৮.৫ সম্বলহীনদের জন্য ন্যূনতম কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

আমাদের জনসংখ্যার জন্ম-মৃত্যুহারের বর্তমান গতিপ্রকৃতি অব্যাহত থাকবে ধরে নিলে দেখা যাচ্ছে যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ শ্রমশক্তি ২০২১ সাল নাগাদ তৈরি হবে। তার অর্থ হল, ৫ কোটিরও বেশি লোকের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, যেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিকদের এক বড়ো অংশ থাকবে। তবে কৃষিখাতে তা আর্থিক লাভজনকভাবে ঘটিয়ে তোলা সম্ভব নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোই নিশ্চয়তা নেই যে, কৃষি থেকে অকৃষি খাতে এ জাতীয় স্থানান্তর দারিদ্র্যপীড়িত স্থানগুলোকে বহাল রেখে করা যাবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সকল আক্রান্ত পরিবারকে আয়-উপার্জনের নিশ্চয়তা দিতে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর সঙ্গে সংগতি রেখে আগামী পাঁচ বছরে 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন' তৈরি করতে হবে, যার ফলে প্রতি জেলায় পরিবার প্রতি একজনের ন্যূনতম বেতনে বছরে ১০০ দিন কর্মসংস্থানের সংবিধিবদ্ধ অধিকার লাভ নিশ্চিত হবে। আমাদের ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটির ভৌগোলিক চাহিদা অনুযায়ী নানান সুযোগসুবিধা এই স্কিমগুলোর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন, প্রধানত ভূমিক্ষয়ের শিকার যে-সব এলাকা সেখানে এই কর্মসূচির অধীনে শ্রমশক্তিকে ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা যায়। একইভাবে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার বনাঞ্চল-সম্পৃক্ত সামাজিক কাজকর্মে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে নিয়োগ করা সম্ভব। মঙ্গাপীড়িত এলাকায় একইভাবে বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচি নিলে আগামী পাঁচ বছরে মঙ্গার অভিশাপ নির্মূল করা যেতে পারে।

৮.৬ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি

দেশে শারীরিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। এর ভেতরে শিশু প্রতিবন্ধী বেশ বড়ো সংখ্যায় রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ, অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ, চাকরি-বাজারে ঢোকার সুযোগ, পরিবহণ জাতীয় জনসেবা ভোগ করা এবং সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তারা নিদারুণ সংকটের মুখোমুখি হয়। তাদের সুপ্ত ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা এ-সব প্রতিবন্ধকতার কারণে করতে পারে না। ২০২১ সাল নাগাদ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন পর্যাপ্তভাবে মেটানো সম্ভব হয়; তার ভেতরে পড়বে শিশুদের বিশেষ চাহিদা পূরণ, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ তৈরি করা এবং সার্বিকভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি।

৮.৭ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

সংখ্যালঘু শ্রেণী যেন আর বৈষম্যের শিকার না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানে আমাদের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান এবং ঋণ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রাপ্তিতে যোগ্যতা অনুযায়ী আত্মবিকাশের সুযোগ তাদেরকে দিতে হবে। সংখ্যালঘুরা যেন আইনের ও আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন

কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নিতে পারে তাদেরকে সে-নিশ্চয়তা দিতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে—শিক্ষায়, সরকারি চাকরিতে, সেবা ও সম্পদের ক্ষেত্রে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ যেন তাদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাবের জন্ম না দেয়; নৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই এক সুসমঞ্জস ও সম-অধিকারভিত্তিক সমাজের উপকারিতা বিষয়ে আমাদের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৮.৮ সহায়সম্বলহীন ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা

উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল লাভ (অভীষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) করতে হলে অল্প সংগতিপন্ন দরিদ্র ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা হল একটি অধিকার ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। সেই লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বিরাট বৈষম্যকে কমানোর জন্য সমাজের অধিক বঞ্চিত স্তরের কল্যাণে মানবসম্পদ বিকাশের প্রতিষ্ঠানগুলোর উদাহরণযোগ্য উন্নয়ন সাধন করা। সে-লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য বড়ো মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, সেইসঙ্গে আমাদের মানবসম্পদ বিকাশের প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ও প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে শিশুশ্রম (তা সে গৃহকাজে কিংবা কলকারখানায় যেখানেই হোক-না কেন) যথাশীঘ্র নিষিদ্ধ এবং তার অন্যথা হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে যাতে গণ্য হয় সে-মর্মে প্রয়োজনীয় আইন করতে হবে।

মানবসম্পদ বিকাশের প্রক্রিয়াকে উন্নীত করার সঙ্গে বৃত্তি (অর্থাৎ অভীষ্ট ৫-এ বর্ণিত বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাভিত্তিক বৃত্তি, প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ অভীষ্ট ৬-এ বর্ণিত বিশেষ গ্রুপের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ), এবং স্বাস্থ্যসেবায় অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি (অর্থাৎ অভীষ্ট ৪-এ বর্ণিত দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র) ইত্যাদি চালু করা হবে।

৮.৯ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিসত্তাগত বৈচিত্র্যকে জাতীয় ঐতিহ্য রূপে বিকশিত করা

আমাদের বৈচিত্র্যকে যদি আমরা স্বীকার না করি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার যদি মেনে না নিই, তাহলে সমাজে অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা ও নির্যাতন দেখা দেবে। মানুষ যখন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অথবা তার জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য নিয়ে অন্যে তাকে অসম্মান করে তখন তার অপমান ও ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এর একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হল আমাদের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো এবং তাকে একটি সম্পদ ও জাতীয় গর্বে রূপান্তরিত করা। এর জন্য শুধু ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতা ও আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সে রাষ্ট্রের—যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়ে সে-সবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকবে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, ভাষার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী নীতি মান্য করার উদ্যোগ নেওয়া ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জন্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কৃতিবৈচিত্র্যকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

আমাদের বৈচিত্র্যকে যদি আমরা স্বীকার না করি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার যদি মেনে না নিই, তাহলে সমাজে অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা ও নির্যাতন দেখা দেবে। মানুষ যখন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অথবা তার জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য নিয়ে অন্যে তাকে অসম্মান করে তখন তার অপমান ও ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এর একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হল আমাদের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো।

সামাজিকভাবে অধিকতর সংহতিপূর্ণ জাতি হতে গেলে শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সে সম্পর্কে সহনশীলতার ধারণা শিশুদেরকে দিতে হবে; জীবনের শুরু থেকেই তারা যেন এমন বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারে, মেনে নিতে পারে—সে ব্যাপারে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির (অভীষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য) ফলে ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ধর্ম ও রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে, এবং যদি জোর দেওয়া যায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কারো ধর্মীয় ও জাতিসত্তাভিত্তিক পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক, তাহলে তাদের শিশুমন সমৃদ্ধ ও উদার হবে।

৮.১০ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস

শহর ও গ্রামের উন্নয়নে যে-পার্থক্য রয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ২০২১ সালের মধ্যে তা কমিয়ে আনতে হবে। শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় (অভীষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) অকৃষিকাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলে স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকেন্দ্রগুলোর প্রসার ঘটবে; এর সূত্রে তা আবার বিভিন্ন অঞ্চলভেদে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের ভেতরেও আয়বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে। স্থানীয় সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য ক্ষমতাকে হিসেবের মধ্যে রেখে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই এ ধরনের উন্নয়ন ঘটবে। গ্রামে ও শহরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে; কারণ, উন্নয়নের পরিধি ও সুফল ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলগুলোর বিপুল সম্ভাবনা রয়ে গেছে। বিপণন, সংগ্রহ ও প্রযুক্তি উন্নত করার যে-সব ক্ষেত্র আছে সে-সব থেকে আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পেতে হলে বিভিন্ন এলাকাগুচ্ছ অথবা শিল্পসমষ্টির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে একত্র করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

আঞ্চলিক বৈষ্যম্যের সুরাহা করার জন্য এমন বিকেন্দ্রিত স্থানীয় সরকারের দরকার যাদের আরও বেশি কর্তৃত্ব ও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকবে। যেমন, একটি 'সমতাবিধান ফর্মুলা'র সাহায্য নিয়ে কোনো এলাকার গড় উপার্জনের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় অর্থ-বরাদ্দ বণ্টন করা যেতে পারে। এমন ব্যবস্থা যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে জেলা প্রশাসনে রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব নির্বিশেষে দরিদ্র জেলাসমূহে প্রত্যেকটি লোকই উন্নয়ন বাবদ আরও বেশি টাকা পাবে। দলের রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে নয়, মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয় উন্নয়নের কাঠামো তৈরি করতে হবে। দেশের বেশি পশ্চাৎপদ অঞ্চলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে—এরকম এলাকার উন্নয়ন-সম্ভাবনা পরিপূর্ণ কাজে লাগাবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি, বেসরকারি ও এনজিওদের শক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করতে হবে।

বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১

২০২১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রটির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। সেই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের মুহূর্তে এদেশের নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভেতর দিয়ে এক সগর্ব জাতির অর্জিত স্বাধীনতার মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এটিই সবার প্রত্যাশা। সেদিক থেকে আমাদের হাতে আছে পনেরোটি বছর। এই সময়পরিধির মধ্যে করণীয় কর্তব্যসমূহ দেশ ও জাতি সম্পন্ন না করতে পারলে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে না।

এই রূপকল্প রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকর ও রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য নাগরিকদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের যে-প্রতিচ্ছবি দাঁড়াবে তার একটি সুস্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করানো। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি নীতি-উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ঐ সময়ের মধ্যে কীভাবে অর্জন করা যায় সে-বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপের ধারণা এই রূপকল্পে দেওয়া হয়েছে।

অভীষ্টগুলো চিহ্নিত করেছেন এদেশেরই নাগরিক সমাজ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-র উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২০শে মার্চ জাতীয় স্তরে এক নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক সেই সংলাপে দেশের বিশিষ্টজনদের নিয়ে 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' গঠিত হয়। এই কমিটির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় রূপকল্প রচনার। এরই ধারাবাহিকতায় পরে দেশের ১৫টি শহরে 'আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে উন্নয়নকর্মী, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, সুশীল সমাজ ও নারী প্রতিনিধিরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পরস্পরসম্পৃক্ত ৮টি অভীষ্টের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা ৮টি বিশেষজ্ঞ পরামর্শসভা আহ্বান করা হয়। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যাতে রূপকল্প বিষয়ে তাদের মতামত জানাতে পারে সেজন্য রূপকল্পের খসড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়। পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ সংবলিত রূপকল্পের একটি পরিকাঠামো জাতির এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে ৯ই ডিসেম্বর ২০০৬ ঢাকায় 'জাতীয় ফোরাম' আয়োজন করে রাজনীতিকবর্গ ও নীতি-নির্ধারকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুস্তকাকারে গ্রন্থিত হয়ে 'বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১' দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার স্মারক আটটি অভীষ্টের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এই রূপকল্পের আলোকে উত্তরোত্তর গড়ে উঠবে বলেই আমরা আশা করি।

ISBN 984-300-000816-1

9 843000 008161